



বিশ্ব জীবন

এপ্রিল-জুন ২০০১ / পঞ্চবিংশ বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্ষুধা পূর্ণ প্রতিপদ
 মিছে হৈছে মিছে,
 নিমিত্তে সুখসুখ
 পাড়ং পূর্ণ মিছেনীচে।
 কি হোলোনা, কি হোলোনা,
 কে তে হোলোনা বি দেনা
 সে মনসি মনসি
 মনসিহৈ মিছে।
 এই যে দক্ষিণে হোলো
 অক্ষয় চিত্তি,
 সুখীল হোলো প্রাপ্ত
 প্রভাতের চিত্তি
 এই যে পূর্ণ দান
 বন্য হোলোনা সুখ,
 মনসি হোলোনা
 এই যে হোলোনা ॥

সুদর্শন, সুরসিক অধ্যাপক প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত প্রায়
সূচনাকাল থেকেই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক
ছিলেন। হয়েছিলেন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য।
১৭ মে তাঁর অকাল জীবনাবসান আমাদের কর্ম জগতে
শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।

একই সঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষও ছিলেন।
ছিলেন বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য
এবং বাংলা বানান সংস্কার উদ্যোগের অন্যতম
বিশিষ্টজন। একসময়ে রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রধান
হিসেবে কাজ করেছেন, অবসর নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি
কলেজ থেকে। তাঁর বেশ কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা
প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রশংসিত হয়েছিল, তাছাড়া পত্রপত্রিকায়
নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন।

সেসব কথা গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি।



রবীন্দ্র জবনা

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুখপত্র

এপ্রিল-জুন ২০০১/ পঞ্চবিংশ বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা

বিষয় সূচী

প্রমথনাথ বিশী : শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি	: দেবব্রত পালিত	১
রবীন্দ্রচর্চায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চার দুটি প্রতিষ্ঠান	: মঞ্জুলা বসু	২৫
রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা	: শ্রীলা বসু	৩৩
পুস্তক পরিচয়	: অরুণকুমার বসু	৫১
পাঠকের চিঠি	:	৫৪
প্রতিবেদন	:	৬০
সম্পাদকীয়	:	৬৬

সম্পাদনা

অরুণকুমার বসু, পিনাকী ভাদুড়ী, অভ্র বসু

প্রমথনাথ বিশী : শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেবব্রত পালিত

প্রস্তাবনা

চল্লিশের দশকে আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনই অধ্যাপনা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রমথনাথ বিশী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ক্রমে অধ্যাপক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সাহিত্যচর্চার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের বিস্মিত করেছে।

১৯০১ সালের ১১ই জুন তৎকালীন রাজশাহি জেলার জোয়াড়ী গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রমথনাথ বিশীর জন্ম হয়। কান্যকুঞ্জের ব্রাহ্মণ পিপরিয়া ওয়ার এক বংশধর জোয়াড়ী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইনিই ‘বিশী’ বংশের পূর্বপুরুষ। প্রমথনাথের পিতামহ প্রতাপশালী জমিদার কেশবনাথ বিশী ছিলেন জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট। তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। তাঁদের কোনো সন্তান না থাকায় নলিনীনাথ বিশীকে তাঁরা দত্তক নেন। এই নলিনীনাথই প্রমথনাথের পিতা।

১৯১০ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাবিদ্যালয়ে প্রমথনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। রাজশাহির প্রখ্যাত আইনজীবী, প্রভুতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পরামর্শেই নলিনীনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রমথনাথ ও তাঁর অনুজ প্রফুল্লনাথকে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনে ‘বিশী’ নামে পরিচিত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজের মেধা, প্রখর বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণের জন্য শিক্ষকদের স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। শান্তিনিকেতনের উদার উন্মুক্ত পরিবেশে জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট শিক্ষকদের কাছে তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছিল। আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদানই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। পুঁথিগত শিক্ষায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষাজীবন অতি আনন্দে কাটিয়েছিলেন প্রমথনাথ। খেলাধুলা, হাসি, সাহিত্যসভা, বনভোজন, সংগীত, অভিনয় ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত হয়ে ওঠেন তিনি। গতানুগতিক স্কুল শিক্ষা না নিয়েও ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসাবে সেখানে যোগ দেন। ১৯২৭ সালে আই. এ. পাশ করে তিনি রাজশাহি ফিরে যান এবং ১৯২৯ সালে রাজশাহির সরকারি কলেজ থেকে

ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। সংসারের দায়িত্ব ছিল বলে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়া বা ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৩২ সালে প্রমথনাথ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। এম. এ. পাশ করার পরও তাঁর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় নি। সারা জীবন তিনি পড়াশোনায় নিবিষ্ট থেকেছেন। ১৯৩৩ সালে তিন বছরের জন্য রামতনু লাহিড়ী গবেষণা বৃত্তি লাভ করে তিনি গবেষণায় নিরত থাকেন।

প্রমথনাথের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৬ সালে। ওই সময় তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। সংবাদসাহিত্য রচয়িতা ও লেখক হিসেবে শনিবারের চিঠির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রবণতা অনুযায়ী ততদিনে অধ্যাপনা তাঁর ভবিষ্যৎ বৃত্তি হিসেবে প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয় এবং ১৯৬৩তে প্রমথনাথ ওই পদে বৃত্ত হন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। অবশ্য অধ্যাপনায় ছেদ পড়ে নি। ১৯৭১-এ তিনি অধ্যাপনা থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেন।

১৯৩৬ সালে যখন প্রমথনাথ বিশী রিপন কলেজে যোগ দেন তখন কলেজের স্বর্ণযুগ চলছে। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জমজমাট আসরে যখন তিনি এসে যোগ দিতেন ভারী হাওয়া তখনি হালকা হয়ে উঠত, চিন্তা ও ভাবনার গাভীর মধ্য মেঘ-হেঁড়া আলোর মতো হাসির হালকা এসে লাগত। মনে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমরা কয়েকজন ছাত্র রিপন কলেজে অধ্যাপক বিশীর ক্লাস করতে গিয়েছিলাম। সে অভিজ্ঞতা আমি আজও ভুলি নি। আমাদের মতো আরো অনেকে তাঁর ক্লাস করতে আসত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কার্যত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য তখন প্রায় শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রমথনাথ বিশীর কর্মজীবন সম্বন্ধে আর দুটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করেন। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপনা থেকে পুরোপুরি অবসর নেবার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে তাঁর জীবনাবসান হয়।

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে

প্রমথ বিশী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন, তাঁরই নিকট সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য যেমন আমি বরাবরই তাঁর সম্বন্ধে একটা কৌতূহল পোষণ করেছি তেমনি ঈর্ষাও বোধ করেছি। ১৯১০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং ১৯২৭ সালে রাজশাহি ফিরে যান। এই দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। প্রকৃতির অব্যাহত দাক্ষিণ্য, নানা বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সমাবেশ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি তাঁর এই শান্তিনিকেতন বাসকে আকর্ষক করে তুলেছিল। এই স্মৃতির কথা ধরা আছে তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ এবং ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ এই দুটি গ্রন্থে। ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র প্রয়াণের তিন বছরের মধ্যে, ১৩৫১ সালে। ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ বেরিয়েছে ১৩৯১ সালে, বিশীর মৃত্যুর কিছু আগে। স্মৃতিচারণা হিসাবে ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ অনবদ্য। এটিকে প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ বলা যেতে পারে।

এক আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলায় প্রমথ বিশী শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। নতুন তৈরি ‘বীথিকা’ ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, নতুন-ছাওয়া চালে খড়ের সিজ গন্ধ পেয়েছিলেন। এই ‘উদ্ভিজ় স্নিগ্ধ সুবাসেই’ তাঁর ‘শান্তিনিকেতনের প্রথম যথার্থ অভিজ্ঞতা।’ সকালে উঠে দেখলেন ছেলেদের দল বাইরে এসে সমস্বরে সম্ভবত কোনো একটি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করছে। এরপর যেটি তাঁর মনে আছে সেটি হল জলযোগের জন্য সকলের সারবন্দীভাবে রান্নাঘরের দিকে যাওয়া।

তখন শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এক-এক বিষয় উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়তে পারত। গণিতে বরাবরই বিশী এক শ্রেণী নিচে পড়তেন। বছর শেষে বিশীকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করতে চাইতেন কর্তৃপক্ষ। গণিতে তাই তাঁকে ডবল প্রমোশন দেওয়া হত। দু’চার দিন চুপচাপ থেকে গণিতে নীচের ধাপে ফিরে আসতেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপক সবাই নিশ্চিন্ত হতেন। বিশী কবুল করেছেন যে জ্যামিতির সাহায্য না পেলে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশই করতে পারতেন না। এটি মুখস্থ করেই পরীক্ষা পাশ করা যেত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বিশী। শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় তখন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। বিশীকে বসতে বলে ‘সবির একটি গাথা আছে’ এই কথাটি একজন ছাত্রকে ইংরেজিতে বলতে বললেন। সবি ক্লাসের অপর একটি ছেলের নাম। ছাত্রটি নির্বিকারচিত্তে বলল : Sabi is an ass। বিশীরা কেউ হাসলেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ‘দেখলি সবি, তোকে গাথা বানিয়ে দিলে?’ এতেও

সবি হাসল না। সম্ভবত পদবৃদ্ধির লোপ হওয়াতে সে কিছু ক্ষুণ্ণই হল। তুচ্ছ হলেও ঘটনাটি বিশীর কাছে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছিল। পেশাদার শিক্ষক হলে হয়তো এই ঘটনায় একটা অনাসৃষ্টি করে বসত। কিন্তু শিক্ষাদানে সহজাত প্রতিভা থাকায় রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে সমস্ত ঘটনাটির উপর একটি হাসির হিম্মোল বুলিয়ে দিয়ে ইংরেজি তর্জমার আবহাওয়া থেকে তাকে একেবারে রূপকথার অনির্বচনীয়তা দান করলেন।

শান্তিনিকেতনের মাঠ জনশূন্য হলেও একেবারে বিজন ছিল না। এখানে এক দল ডাকাতের বাস ছিল। ডাকাতেরা ছিল ভুবনডাঙা গ্রামের অধিবাসী। জনশ্রুতি ছিল ডাকাতেরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস আরম্ভ করে। এই ডাকাতদলের সর্দারকে অল্প বয়সে বিশীরা শান্তিনিকেতনের পরিচারক হিসেবে দেখেছিলেন।

আশ্রমের রোগীদের জন্য একটি ঔষধালয় ও হাসপাতাল ছিল। তখনকার দিনে না ছিল বিদ্যুতের আলো, না ছিল জলের কল। রবি নামে একজন ভূত্য লণ্ঠন সাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে দিয়ে আসত। পরে বিদ্যুৎ এসে গেলে অবশ্য আলোর অসুবিধে আর ছিল না।

আশ্রমে কয়েকটি গভীর ইদারা ছিল। স্নান ও পানের জন্য এই ইদারার জলই ব্যবহার করা হত। গ্রীষ্মকালে ইদারার জল শুকিয়ে গেলে জলকষ্ট দেখা দিত। শীতকালে ছিল অন্য ধরনের কষ্ট। ভোরবেলা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ধরা জলে স্নান করতে হত। বিশী বলেছেন এখনকার শান্তিনিকেতনে সুখসুবিধা অনেক বেশি কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের যে সুযোগ পেয়েছিলেন পরবর্তীকালের ছাত্ররা তা পায় নি। ছেলেদের কাছে থাকবার জন্য কবি তখন দোতলায় থাকতেন কিন্তু পরে তিনি ছেলেদের একটি ঘরেই বসবার জায়গা করে নিয়েছিলেন। বিশীরা বড়ো হয়ে দেখেছেন এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ছেলেদের কোনো ঘরে ঢুকে পড়তেন। নানা রকম নতুন খেলা উদ্ভাবন করতেন। এ সব খেলা ছিল শব্দের মিল বা কবিতার ছত্র নিয়ে। অনেক সময় তিনি গল্পের সূত্রপাত করে ছেলেদের চালিয়ে যেতে বলতেন। মাঝে মাঝে নিজের কবিতা পড়েও শোনাতেন। ছাত্রদের কাছে এর থেকে কাম্য আর কী থাকতে পারে?

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রম

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ দিয়ে বিশীদের পাঠ আরম্ভ হয়। শিশুর 'কাগজের নৌকা' ছিল তাঁর প্রথম পঠিত রবীন্দ্র-কবিতা। কবিতাটি পড়তে পড়তে তাঁর মনে ছেড়ে আসা বাড়ির কথা মনে পড়ত। ক্রমে আর-একখানি পাঠ্য ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত'। বিশী বলেছেন

শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রামায়ণ মহাভারত ও রবীন্দ্র-কাব্যের উপরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। বাংলা পড়াতেন তেজেশবাবু। ঘরের বাইরে গাছের তলায় ক্লাস বসত। ছাত্র, অধ্যাপক প্রত্যেকের বসবার জন্য একখানা করে আসন থাকত। গণিত শেখাতেন জগদানন্দবাবু। তিনি কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন। অঙ্কে আঁক বলতেন। পড়া না বলতে পারার বিপদে বৃষ্টি খুব সাহায্য করত। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মারবার নিয়ম ছিল না। তবে কখনো এর ব্যতিক্রম হয় নি এমন নয়। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাতে মারের দাগ মনের মধ্যে পৌঁছত না। তখনকার দিনে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানটিতে একটি নিবিড় পারিবারিকতার ভাব ছিল। প্রথম ছুটির অনুভূতির কথা লিখেছেন বিশী। সেটি ছিল পুজোর ছুটি। আশ্বিনের নির্মল আকাশের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। শরতের গানের সুর তাঁর চোখে পৃথিবীর চেহারাই যেন বদলে দিয়েছিল।

ছুটির সময় ছেলেদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য সাধারণত অভিভাবকেরা আসতেন। ঢাকা ত্রিপুরা অঞ্চলের ছেলেদের দলবদ্ধ করে কোনো একজন শিক্ষকের সঙ্গেও পাঠানো হত। দু'-এক দিনের মধ্যেই আশ্রম জনশূন্য হয়ে যেত। আশ্রমের ছুটি হবার সময় অনেক অতিথি আসতেন। যাঁরা দু-তিন দিন থাকতেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় দেখতেন। এই উপলক্ষেই বিশী প্রথম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দেখেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসতেন। আর আসতেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, কালিদাস নাগ এবং অমল হোম। তখন তাঁরা যুবক ছিলেন।

সেবার ছুটির সময় দুটি নাটক অভিনীত হয়, 'শারদোৎসব' ও 'বিসর্জন'। নাটকের অভিনয় বিশী এই প্রথম দেখলেন। গোবিন্দমাণিক্য সেজেছিলেন সন্তোষ মজুমদার ; গুণবতী সুধীরঞ্জন দাশ। অপরাূপের আর-একটা বাতায়ন তাঁর কাছে খুলে গেল। তিনি মুগ্ধের মতো বসে নাটক দেখলেন।

বয়সের কম-বেশি অনুসারে ছাত্ররা আদ্য মধ্য ও শিশু—এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। শিশু বিভাগ ছিল একেবারে ছোটোর দল। সারা দিনে যা যা করতে হত তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বিশী। ছেলেদের নিজের নিজের সব কাজ করতে হত। ব্যায়াম ও উপাসনার সময় নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক কাজের জন্য ঘণ্টা বাজত। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছেলেদের লাইন করতে হত। কাপ্তেনরা (Captain) সব কিছু তত্ত্বাবধান করত। ক্লাস আরম্ভের আগে নিয়মিত বৈতালিক গান হত। ক্লাস শেষ হলে জলখাবার খেয়ে ছেলেরা লাইন করে খেলতে যেত। খেলার মধ্যে শীতকালে ক্রিকেট, অন্য সময় ফুটবল। ফুটবল খেলাই বেশি জমত। একদিন সকলকে ড্রিল করতে হত, আর একদিন জঙ্গল পরিষ্কার বা ওই জাতীয় কিছু। জগদানন্দবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবুর গল্প বলবার

অসামান্য ক্ষমতা ছিল।

কাপ্তেনদের সংখ্যা কম ছিল না। প্রত্যেক ঘরের জন্য একজন কাপ্তেন থাকত। কাপ্তেনদের উপরে ছিল বিভাগীয় কাপ্তেন এবং সকলের উপরে একজন জেনারেল কাপ্তেন বা অভিনায়ক। সমস্ত কাপ্তেন পদই ছিল নির্বাচনমূলক। কাপ্তেনদের খুবই প্রতাপ ছিল।

শান্তিনিকেতনে দিনযাপন

৭ই পৌষের উৎসব আশ্রমের সবচেয়ে জমকালো পর্ব। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা আবার আশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা। দুই দিন ধরে তাই খুব ধুমধাম হত। উৎসবের দিন অন্ধকার থাকতে উঠতে হত। ভোরবেলা মন্দিরে উপাসনা হত। মন্দিরের উত্তরের মাঠটি এক রাত্রির মধ্যে দোকানে তাঁবুতে গাড়িতে নাগরদোলায় শামিয়ানায় ভরে যেত। হাজার হাজার লোকের সমাগম হত। আশ্রমও অতিথিসম্মানে পূর্ণ হয়ে যেত।

দুপুরবেলা আহাৰান্তে যাত্রাগান আরম্ভ হত। বিশী তন্ময় হয়ে শুনতেন। শীতের রোদ নিস্তেজ হয়ে আসত, বাতাস ঠাণ্ডা হত আর তখন মেলার কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠত। আর তার সঙ্গে তাল রেখে বাজত বাজিওয়ালার ডুগডুগি, বাউলের একতারা, ফিরিওয়ালার বাঁশি আর সাঁওতাল-নাচের মাদল।

সন্ধ্যার আগে রাজকীয় ধরনে খাওয়া। পরে আবার মন্দিরে যাওয়া, মন্দিরের দেখবার মতো আলোকসজ্জা! পাঁচটা ঝাড়ে মোমবাতির আলো, মেঝেতে বাতিদানে অসংখ্য মোমবাতি। সন্দের সময় মেলার ভিড় এত বেড়ে উঠত যে সে ভিড় সংযত করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। সবশেষে বাজিতে আগুন দেওয়া হত। বাজি পোড়ানো শেষ হলে বিশীরা ঘরে ফিরে যেতেন। ৮ই ও ৯ই পৌষ অন্যান্য অনুষ্ঠান থাকত।

নতুন বছরের ক্রাস আরম্ভ হতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ হয়ে যেত। অধিকাংশ ছেলে এ সময়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে এক-এক দিকে বেড়াতে যেত। কেন্দুবিশ্ব গ্রামে জয়দেবের পীঠস্থান আর নানুরে চণ্ডীদাসের। দু' জায়গাতেই মেলা বসত। অনেকে মেলা দেখতে যেত। এক সময়ে বীরভূমি থাকলেও চিরকালের জন্য বীরভূম কবিভূমি বলে পরিচিত হয়েছে—জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতনে ক্রাস দুইবেলা হয় ; একবার সকালে, একবার বিকেলে, মাঝখানে বিরাম। পূজোর ছুটির পর থেকে গরমের ছুটি প্রায় ছ-মাসের ধাক্কা, দিন আর কাটতে চায় না। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি গরম বেড়ে গেলে বিকেলবেলার ক্রাস বন্ধ হয়ে কেবল সকালে ক্রাস হত। ইদারা শুকিয়ে এলে

ছেলেদের বাঁধে স্নান করতে পাঠাতে হত।। সেবারে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মতিথি বলে ঠিক হল ছুটি ২৫শে বৈশাখের পরে হবে। গুরুদেবের জন্মোৎসব বলে কারো বিশেষ দুঃখ হল না।

গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে আরামের সময়টি হল রাত্রি। গরমের জন্য সকলের বাইরে শোবার ব্যবস্থা। তক্তাপোশখানা টেনে মাঠের মধ্যে এনে চারখানা বাঁখারি বেঁধে মশারি টাঙানোর বন্দোবস্ত। সারাদিন রোদে পুড়ে সে কী স্নিগ্ধ বিরাম! এখানে প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন বিশী — কোকিলের ডাক, পুষ্পিত শালবীথিকার ঘনশুভ্র শীর্ষ, দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুর, যেন একটা রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করত। আশ্রম তখন নীরব। স্পন্দিত তারাগুলি শুধু জাগ্রত।

আশ্রমের প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে ছাড়া আর যাদের প্রমথ বিশী শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, শরৎকুমার রায়, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপাল চন্দ্র রায়, এইচ. পি. মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, জাহাঙ্গীর ভকিল, ভীমরাও শাস্ত্রী, তেজেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির অপরিহার্য অঙ্গ ছিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ ছাত্র-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। ছাত্রদের স্বাধীনতার পরিধি তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। শিক্ষকরা ছিলেন পুরানো ধাঁচের মানুষ এবং ছাত্ররাও এই সংকীর্ণতার পরিপোষক ছিল। রবীন্দ্রনাথকে ডিসিপ্লিন নিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বিষয়টি শিক্ষকদের হাত থেকে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সাহিত্যচর্চার শুরু

সাহিত্য সম্বন্ধে মনে কোনো পূর্বসংস্কার না থাকলেও সাহিত্যচর্চাই বেছে নিয়েছিলেন প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ কাব্য পাঠ্য ছিল, ‘সেই কাব্যমালঞ্চ ডাকাতি করিয়া কবিতা লিখিত হইল’। মনে হয় রবীন্দ্র-কবিতার ভাব অবলম্বনে কবিতা লিখেছিলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যে সকলে তাঁকে কবি বলে জেনে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌঁছল কথাটা। তিনি বিশীর কবিতা দেখতে চাইলেন। বিশী রবীন্দ্রবন্দনা করে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে তাঁকে দিলেন। কবি কবিতা পড়ে হাসলেন এবং তাঁকে আনারস ও পুডিং খেতে দিলেন। চলে আসবার আগে তাঁর চুল ধরে একটু টেনে দিলেন। ক্রমে সভাসমিতিতেও বিশী নির্ভীকভাবে কবিতা ও অন্যান্য রচনা পড়তে লাগলেন। তাঁর সাহিত্যের সঙ্গীদের

মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় ভালো কবিতা লিখতেন। বিশী তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও সতীশচন্দ্র রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অকালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সতীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে প্রমথ বিশী সদ্যস্থাপিত বিশ্বভারতীতে ভর্তি হলেন। আবার তাঁর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হল। ততদিনে তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটা গল্প বলে নাটক লিখে আনতে বললেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দু'তিন বার লিখলেন এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই কাটছাঁট করে কিছু নিজে লিখে নাটকটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নাটক লেখার এটাই বিশীর একমাত্র শিক্ষানবিশি। বিশীর মতে রবীন্দ্রনাথ নিজের সময় ব্যয় করে অপরিণত লেখকের লেখা সংশোধন করতেন কারণ তাঁর অতি প্রচুর সাহিত্যিক শক্তির বিকাশের এটাও ছিল অন্যতম পন্থা।

আশ্রমে অশোক গাছ ভেবে রবীন্দ্রনাথ একটি গাব গাছ লাগিয়েছিলেন। গাছটি বড়ো হবার পর তিনি তাঁর ডুলটি বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন বিশীর সঙ্গে সেখান দিয়ে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, 'তোকেও অশোক গাছ বলে লাগিয়েছি, বোধ করি গাব গাছ!' বিশী রবীন্দ্রনাথের কথায় দুঃখ পেয়েছিলেন। নিজেকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে জেনেও বিশী ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। সবাই এটা করতে পারত না।

এক কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথ কোজাগরী উৎসবের জন্য প্রমথ বিশীকে একটা কবিতা লেখার ফরমায়েশ করলেন। বলে দিলেন, কবিতার প্রধান মিলগুলি যেন 'লক্ষ্মী' শব্দের সঙ্গে মেলে। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত বিশী কবিতাটি লিখে ফেললেন এবং তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দও হয়ে গেল। উত্তরায়ণের ছাদে যে ক্ষুদ্র উৎসব সভাটি বসেছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা পড়লেন, বিশীর কবিতাটিও পড়া হল।

আশ্রমে ছেলেদের অনেকগুলি হাতে-লেখা পত্রিকা ছিল। ছোটো ছেলেদের কোনো কাগজ ছিল না, বিশীরা তাই 'শিশু' বলে একটি পত্রিকা বের করে ফেললেন। এই সব কাগজে অধ্যাপকদের রচনা আদায় করে প্রকাশ করা হত। রবীন্দ্রনাথের লেখা যেটা খুশি প্রকাশ করা হত। তার পরে এক সময়ে দৈনিক কাগজ বের করবার হুজুগ পড়ে গেল। একখানা লম্বা কাগজে নিজেদের মন্তব্য লিখে আশ্রমে প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হত, সকলে পড়ত। এতে অবশ্য সাহিত্যের চেয়ে সাংবাদিকতার আয়োজন ছিল বেশি।

হঠাৎ একবার মফস্বলের একটি কাগজে বিশীর লেখা প্রকাশিত হল। যেদিন ডাকে কাগজখানা এল সে দিনটিকে বিশী তাঁর জীবন-ক্যালেন্ডারে লাল-চিহ্নিত তারিখ বলে বর্ণনা করেছেন। লেখাটিকে তিনি নানাভাবে বারবার পড়লেন। শেষ ছত্রে নামটি দেখে তাঁর আর তৃপ্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সুপরিচিত এই

পদটির উল্লেখ করেছেন তিনি : জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!

এই সময়ে আশ্রমে ছাপাখানা স্থাপিত হল। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। বিভূতি গুপ্ত ও বিশী মিলে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করে ফেললেন। নাম 'বুধবার'। বুধবার ছুটির দিন, সেই দিন কাগজখানা বের হত। একখানা ফুলস্কেপের দুই পৃষ্ঠা ছাপা। মূল্য দুই পয়সা। কাগজের বিক্রি তেমন উৎসাহব্যঞ্জক না হলেও কাগজ চলতে লাগল। পৌষ উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথের সকালবেলার উপাসনার সঙ্গে যে গানগুলি গাওয়া হবে সেগুলি দিনুবাবুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিশীরা 'বুধবার'-এর উৎসবসংখ্যায় ছাপিয়ে দিলেন। বিপুল সংখ্যায় কাগজ ছাপা হল কিন্তু মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হলে দেখা গেল যে সব গান গাওয়া হচ্ছে সেগুলো সব নতুন গান। দিনুবাবুর কাছ থেকে জানা গেল আগের দিন সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথ সব গান বদলে দিয়েছেন। বিশীরা অত্যন্ত নাকাল হয়েছিলেন এ ঘটনায়। তারপর 'বুধবার' আর বেশি দিন চলে নি।

আশ্রমে ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ 'শান্তিনিকেতন' নামে একখানা কাগজ বের করেন। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন জগদানন্দবাবু, পরে শাস্ত্রীমশায়। সন্তোষ মজুমদার এবং বিভূতি গুপ্ত হয়ে সম্পাদনার ভার প্রমথ বিশীর উপর পড়ে। বিশী তিন বছর কাগজটির সম্পাদক ছিলেন। তারপর সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

আশ্রমে গোড়া থেকেই একটা অভিনয়ের আবহাওয়া ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকে ইশা খাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে বিশী সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। অভিনয়-প্রসঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করে বিশী বলেছেন তিনি নিজেই একটি ইনস্টিটিউশন ছিলেন। তিনি তাঁকে উৎসবের প্রতীক বলেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রথম দেখেন তাঁর পঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনীত 'রাজা' নাটকে অদৃশ্য রাজার ভূমিকায়। একে দেখার চেয়ে শোনা বলাই সম্ভব। 'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সম্রাট বিজয়াদিত্য সেজেছিলেন। শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' বছর অভিনীত হয়েছে। বিশী একাধিকবার রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সে সময়ে প্রয়োজন হলে ছেলেরাই মেয়ে সাজত। সুধীরঞ্জন দাশ ও অজিত চক্রবর্তী স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

বিশী অভিনেতা হিসেবে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাম করেছেন। একবার তাঁকে 'বিনি পয়সার ভোজ' নামে একচরিত্র নাটক পাঠ করতে দেখেছিলেন। সমস্ত ভূমিকাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হত। দিনুবাবু, ক্ষিতিমোহন বাবু, জগদানন্দ

বাবু, অসিত বাবু—সকলেরই অভিনয় দক্ষতার কথা বলেছেন বিশী। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভদ্রসমাজে নৃত্যকলা প্রদর্শনের প্রচলন করেন কিন্তু একদিনে তা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের শিক্ষিত লোকের মত-পরিবর্তন করে ছেড়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের ফুটবল টীম প্রায় অজেয় ছিল। কলকাতার অনেক কলেজের টীম শান্তিনিকেতনে খেলতে যেত কিন্তু কোনো দল যে বিজয়ী হয়ে ফিরেছে বিশীর এমন মনে পড়ে না। আশ্রমের খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরে কলকাতার নামজাদা দলে যোগ দিয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কোনো শীল্ড জয় করে আনলে পরদিন অবধারিত ছুটি। ছুটির ব্যাপারে আপীলের উচ্চতম আদালত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পূজোর ছুটির পর এক সন্ধ্যায় ছাত্রদের রান্না ঘরে ঢুকে অজিত চক্রবর্তী হঠাৎ ঘোষণা করলেন, ‘গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন’। ক্রমশ ক্ষিতিমোহন বাবু, জগদানন্দবাবু এবং অন্যান্যরা এলেন। সকলেই উত্তেজিত এবং চঞ্চল। পরে টেলিগ্রাম এলে রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়ে নেপালবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, “নিং নেপালবাবু, আপনার ড্রেন তৈরি করবার টাকা।” আশ্রমে টাকার টানাটানি চলছিল, একটা পাকা নর্দমা আধ খোঁড়া অবস্থায় পড়ে ছিল।

বিশিষ্ট মানুষজন

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। টেলিগ্রাম আসে ১৩ই নভেম্বর। একদিনে আশ্রমের চেহারা বদলে গেল। অচিরে অতিথি-অভ্যাগতে আশ্রম ভরে উঠল। ২৩শে নভেম্বর কলকাতা থেকে পাঁচ-সাতশো মানুষ কবিকে সংবর্ধনা জানাতে স্পেশাল ট্রেনে করে শান্তিনিকেতনে এলেন। আশ্রমকুঞ্জে সভার আয়োজন হল। জগদীশচন্দ্র ছিলেন সভাপতি। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তাতে তাঁর মনের তিক্ততা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন পশ্চিমের স্বীকৃতিতে সে সংবর্ধনা জানানো হল তা তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না।

কবির প্রতিভাষণ সারা দেশে বিস্ফোভের সঞ্চার করেছিল। প্রমথ বিশী বলেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় তিনি কোনো দোষ দেখতে পান না কারণ দেশের লোক তাঁকে যথার্থই অবজ্ঞা ও অনাদর করেছিল। প্রতিবাদ না করলে কবি হিসাবে তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অধর্ম হত।

শ্রদ্ধার সঙ্গে সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ ও উইলিয়াম পিয়র্সনের কথা বলেছেন প্রমথ বিশী। আর্ন্ত্রাণকে দুজনেই জীবনের ব্রত করেছিলেন। অ্যান্ড্রুজ ছিলেন সচল, সক্রিয় প্রকৃতির লোক, আর পিয়র্সন ছিলেন শান্ত সমাহিত প্রকৃতির। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অ্যান্ড্রুজই করিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত

তিনি এই দুজনের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন প্রমথ বিশী। শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকের একটি বাড়িতে বাস করতেন ঋষিকল্প এই মানুষটি। বাড়িটির নাম 'নিচু বাংলো'। এই নির্জন স্নিগ্ধ আশ্রমে বর্ষীয়ান দার্শনিক লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন। তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন এবং মেঘনাদবধ কাব্য ছেড়ে দিলে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ'কে দীর্ঘ বাংলা কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বিশী যখন বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করেন তখনও বিশ্বভারতী অর্থাৎ উচ্চতর বিভাগটি রীতিমত গড়ে ওঠে নি। দু-একজন ছাত্র, দু-একজন অধ্যাপক মাত্র সমবেত হয়েছে। বিশী বলেছেন তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী অন্ধদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়কে বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র বললেও বলা যায়। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের আদেশ হল যে ছাত্র, অধ্যাপক সকলকেই পাণিনির ব্যাকরণ পড়তে হবে। পড়া আরম্ভ হল কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ কারো ভালো লাগল না। ক্রমশ ব্যাপারটি একটি প্রহসনে পরিণত হল। বয়স্ক ছাত্রেরা অব্যাহতি পেলেন কিন্তু বিশী ও চলমায় পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ দুপুরে বিশী এবং চলমায়কে ইংরেজি পড়াতেন। একদিন তিনি ডাইং শব্দের অনুবাদে 'মুমূর্ষু' বললে বিশী আপত্তি করেন। তিনি বলেন শব্দটি 'প্রিয়মাণ' হবে। রবীন্দ্রনাথ কে বলেছে জানতে চাইলে বিশী বলেন 'স্বয়ং ভগবান পাণিনি'। রবীন্দ্রনাথকে নির্বাক দেখে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় হয় ; লোকটার তো মরবার ইচ্ছা ছিল না, তাই 'মুমূর্ষু' না হয়ে হবে 'প্রিয়মাণ'। রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেকক্ষণ বাকস্ফূর্তি হল না। তিনি বললেন, 'শাস্ত্রীমশায়কে গিয়ে বল যে, তোর আর পাণিনি পড়তে হবে না।' এইভাবে পাণিনি পড়া থেকে বিশী অব্যাহতি পেলেন।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিনি প্রধানত শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলে ছিল তাঁর নিজের শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর মনে হয়েছিল বিদ্যালয়গুলি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অসম্ভব বস্তু। এক দিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ যেমন তাতে নেই, তেমনি আবার আর-এক দিকে মানবীয় সম্পর্কের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করার সময় এই দুটি কথাই রবীন্দ্রনাথ মনে রেখেছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে স্থাপিত হওয়ায় প্রকৃতির স্পর্শ দ্বিতীয় মাতৃস্তন্যের মতো বালকদের দেহে মনে অবচেতনভাবে সঞ্চারিত হত। শান্তিনিকেতনকে প্রমথ বিশী চিত্র ও সংগীতের দানসত্র এবং রবীন্দ্র সংগীতের ঝরনাতলা বলে বর্ণনা করেছেন। ছবি ও গান এখানকার শিক্ষা পদ্ধতির অঙ্গীভূত। এখানে শিশুদের একান্তভাবে শিশু মনে করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ নীচের দিকের ক্লাসে কীটস-এর অটাম বা শেলির ইন্টেলেক্চুয়াল বিউটি পড়াতেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়ে বসত।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন বাংলা বললে কম বলা হয়—এখানকার জীবনেরই বাহন বাংলা ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার বাতিক ছিল, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তিনি ভালোই করতেন। আশ্রমের কারো অসুখ হয়েছে শুনলে আগ্রহ সহকারে তাকে ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। ‘পঞ্চতিষ্ঠ পাচন’ নামে একটা পাচনের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। এটা তাঁর কাছে মকরধ্বজের মতো সর্বরোগহর ছিল বললেও চলে। ছাত্রদের এই পাচন অবশ্য পানীয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বৈকালিক চায়ের টেবিলে অধ্যাপকদের অনেকেরই ডাক পড়ত। নানা রকম ফল ও মিষ্টিতে টেবিল ভরা থাকত। মাঝে মাঝে বিশীও যেতেন। তখন রবীন্দ্রনাথের খাস খানসামা ছিল সাধুচরণ। বিশীকে দেখলেই তিনি সাধুচরণকে বলতেন, ‘ওরে ভালো করে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করিস।’ একদিন দুপুরবেলা তিনি যখন পড়াচ্ছেন সাধুচরণ তাঁর হাতে একটি কাচের গেলাসে করে কী একটা পানীয় এনে দিল। কাঁচা সোনার মতো তার রঙ। বিশীর লুপ্ত দৃষ্টি গেলাসটার চার দিকে ঘুরছিল। পান শেষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ‘কী রে, খাবি নাকি?’ বিশী সম্মতি জানাতেই সাধুচরণ আর-একটি গেলাসে পানীয় এনে দিল। এক চুমুক পান করে বিশী দেখলেন সেটা নিমের পাতা-সিদ্ধ জল। তখন আর ফেরবার উপায় ছিল না ; তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশব্দে হাসিমুখে গিলে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করাতে বিশী সপ্রতিভভাবে জানানেন তাঁর চমৎকার লেগেছে। তাঁর সহপাঠীদের উশখুশ করতে দেখে রবীন্দ্রনাথ রহস্যভেদ করে দিয়ে বললেন, ‘আপনারা অকারণ চঞ্চল হবেন না, নিমের জল!’

রবীন্দ্রনাথের গান সিদ্ধুপারের পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে আসত ; এক-এক ঝাঁকে এক-এক জাতের পাখি। প্রমথনাথ বলেছেন তাঁর প্রথম বয়সের গান আবেগপ্রধান এবং শেষ বয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান। প্রথম বয়সের গানের মুখ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে আর শেষ বয়সের গানের মুখ অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে। মধ্য বয়সের গানের পর্বটিকে রবীন্দ্র-গানের গিরিমালার ওয়াটার শেড বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রকৃতির লীলাঘরে আবদ্ধ হয়ে মধ্য বয়সে মানুষের ঘরে এসে প্রবেশ করেছে এবং শেষ বয়সে আবার প্রকৃতির সেই লীলাঘরে ফিরে এসে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সুরের এই সুরধুনীর উপত্যকায় শান্তিনিকেতন—পল্লীর অবস্থিতি। এখানকার জীবনস্রোত এই নদীর সঙ্গে মিশে নিয়ত বয়ে চলেছে।

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এইসব উৎসবকে অহেতুক মনে করবার কোনো কারণ নেই। জড়তাগ্রস্ত মনকে জাগিয়ে রাখবার জন্যই এগুলির

প্রয়োজন। ঋতু-উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনের জীবনের প্রধান অঙ্গ। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি গোড়া থেকেই ছিল ; শেষের দিকে হল কর্ষণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি উৎসবও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে এইসব অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে দেবে। তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে শান্তিনিকেতনের জীবন চলেছে। এখানে আর-এক শ্রেণীর উৎসব আছে যা মানুষকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পৌষ-উৎসব : মহর্ষির দীক্ষা ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী। আনন্দবাজার নামে একটি মেলার কথাও বিশী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় সমস্ত উৎসবই খোলা আকাশের উৎসব। প্রকৃতি সদয় থাকায় বড়ো একটা অসুবিধা কখনো হয় নি।

প্রকৃতি পরিবেশ

শান্তিনিকেতনের মাঠ রিস্ত বলেই নতুন নতুন ঋতুর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণরূপে ভরে উঠতে পারে। ছয় ঋতুর পূর্ণ আবর্তনের প্রকাশ এখানে যেমন দেখতে পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। প্রমথ বিশী জন্মেছেন লাল মাটির দেশ বরেন্দ্রভূমে। লাল মাটির দেশ শান্তিনিকেতনে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম। তিনি বলেছেন তাই তাঁর দুই জীবনের দুই উদয় দিগন্ত লাল মাটির আভায় চিররস্ত্রিম।

বীরভূমের প্রকৃতি যেন রবীন্দ্রনাথের মনের উপর নিজেকে উৎকীর্ণ করে দিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের মাঠে অঝোরে বৃষ্টি আর শালবনে বাতাসের উদ্দামতা বিশীকে মনে করিয়ে দিয়েছে এই চরণটি—‘শালের বনে থেকে থেকে / ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, / জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের ‘পরে।’

তিনি বলেছেন শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের টীকাকার। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঋতুরাজ একই সঙ্গে রাজা ও সন্ন্যাসী ; ঐশ্বর্য তাঁর সত্য বলেই ত্যাগে তাঁর দুঃখ নেই।

বর্ষার জলে ক্ষয়ে-যাওয়া কাঁকর-বের-হওয়া ভাঙা ভাঙা ডাঙাকে ওই অঞ্চলের লোকেরা খোয়াই বলে। এই খোয়াই বীরভূমের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে পড়ে আছে। খোয়াই বাদ দিয়ে শান্তিনিকেতনকে ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর কবিতা আছে খোয়াইয়ের উপর।

কোপাই বিশেষভাবে বীরভূমের নদী, অজয়ের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। সতেরো বছর পরিচয়ের সপ্তদশী কোপাইয়ের বিশী নাম রেখেছিলেন কোপবতী। শান্তিনিকেতনবাসীদের সঙ্গে কোপাই ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

প্রমথনাথ কোপাই নদীর উৎসটি দেখতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। দল জুটিয়ে বেরিয়েও পড়েছিলেন কিন্তু প্রথম দু'বছর তারা উৎস পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি।

তৃতীয় বছর তাঁদের দল উৎসে গিয়ে পৌঁছেছিল। জায়গাটার নাম খেজুরি, সাঁওতাল পরগণার প্রায় সীমান্তে।

বিভূতি গুপ্ত ('বুধবার'-এর যুগ্ম সম্পাদক) একটা যাত্রাপালার লেখা দু'চার পাতা বিশীকে দেখিয়েছিলেন। বিশীর ভালো লাগায় তিনি পালাটি লিখে শেষ করে ফেললেন। অভিনয়ের ব্যবস্থা কীভাবে হবে তা নিয়ে দৃষ্টিস্ত ছিল কিন্তু নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর সহায়তায় ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেল। গোসাঁইজির রসজ্ঞান পাণ্ডিত্যের চেয়ে কম ছিল না। তিনিই শেষ পর্যন্ত দলের অধিকারী হয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর একদিন রাতে আশ্রমপ্রাঙ্গণে যাত্রার আসর বসল। দর্শকদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছিলেন। পালাটির নাম ছিল 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়'। এর পর আরো পালা লিখেছিলেন বিশী। তখন যাত্রার গান আশ্রমের অনেকের মুখেই সর্বদা শোনা যেত। রবীন্দ্রনাথের ব্লোক হল যাত্রা লিখবেন। একদিন বিশীকে বললেন, 'দেখ, এবার যাত্রাপালা লিখব ভাবছি।' বিশী বললেন, 'সাহিত্যের সব পথই তো আপনার পদচিহ্নিত ; এক-আধটা গলিপথও কি আমাদের মতো আনাড়িদের জন্য রাখবেন না?' রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা যা।' ভাবটা এই, 'ও পথটা তোদেরই ছেড়ে দিলাম।'



মজার গল্প

চোর ধরার একটি মজার গল্প বলেছেন প্রমথ বিশী। মেয়েদের বোর্ডিংয়ে চুরি হচ্ছিল বলে তাঁকে এক রাতে চোর ধরতে যেতে হয়। চোর তার অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন অন্ধকারে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। চোর ছাড়াই তিনি ফিরে এসেছিলেন। নেপালবাবুর নির্দেশে পরের বার তাঁকে ডাকা হয় এবং তিনি খড়ম পায়ে খোয়াইয়ে চোর ধরতে যান। উঁচুতে ওঠার সময় কঁাকরে খড়ম ফসকে তিনি হড় হড় করে নেমে আসেন আর বিশী ও বিভূতি গুপ্ত তাঁকে টেনে তোলেন। উপরে উঠে আবার নামবার সময় তিনি বিশীদের বলেন তাঁকে টেনে রাখতে। নেপালবাবুর নির্বিঘ্নতাই তখন তাঁদের লক্ষ্য হল, চোরের দিকে মনোযোগ দেবার কোনো সুযোগই হল না। চোর ধরা প্রহসনে পরিণত হল।

একটা বাঘ-শিকারের গল্পও বলেছেন বিশী। সাঁওতালদের কাছে খবর পেয়ে নরভূপ রায়, সবি ও মণি দত্ত তালতোড়ের বাঁধের ধারে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিল। নরভূপের নাকি নেপালের জঙ্গলে বাঘ শিকারের অভ্যাস ছিল। সন্তোষবাবুর একটি বন্দুকের কথা শোনা যেত কিন্তু কেউ সে বন্দুক দেখে নি এবং গুলির কথাও কেউ সঠিক বলতে পারল না। বিশী, ভজু ও আরো

কয়েকজন বাঘ মারার বিপক্ষে ছিলেন। শিকারীরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা খবর পেল যে বাঘ এসেছে। তারাও দলে দলে বাঁধের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। বাঘ তাড়ানোর জন্য ছাতা হাতে সঙ্গে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার বীরেন সেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জগদানন্দবাবু এসে অনুনয় করে বিশীদের আশ্রমের দিকেই থাকতে বললেন কারণ হঠাৎ বাঘ এসে পড়লে লোকের দরকার হতে পারে। সঙ্গে হয়ে আসায় বিশী ও ভজু নিজেদের ঘরে আশ্রয় নিলেন। হঠাৎ তুমুল জয়ধ্বনি শোনা গেল এবং দুজনেই সেই বিজয়ী জনতার দিকে ছুটলেন। নিমেষে ভজু বিশীকে পিছনে ফেলে অস্তিত্বিত হয়ে গেল। জনতার মধ্যে প্রবেশ করে বিশী দেখলেন একখানা গোরুর গাড়ির উপরে একটি সদ্যমৃত চিতাবাঘ এবং চারি দিকে বিজয়ী শিকারীর দল। হঠাৎ বাঘের লেজ ধরে শিকারের উল্লাসে উদ্দীপ্ত ভজুকে দেখা গেল। সে সকলকে শিকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছে। বিশী হটবেন কেন? তিনি বললেন, ‘ওঃ! এই বাঘ? এ যে বাঘসি।’ তিনি বুঝিয়ে বললেন আম শুকিয়ে যেমন আমসি, বাঘ শুকিয়ে তেমনি বাঘসি হয়েছে। এত আয়োজনের পর শেষপর্যন্ত এই বাঘ মারায় তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। এতে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বিশী তৎক্ষণাৎ অঙ্ককারে গা ঢাকা দিলেন। বাঘ শিকারে নরভূপ, সবি ও মণি দস্তুর কৃতিত্ব ছিল। বাঘটা নরভূপকে আক্রমণ করে আহত করেছিল।

বাঘ-পর্ব এখানেই শেষ হল না। সকলকে অবাক করে দিয়ে আশ্রমবাসী সুধাকান্ত রায় এসে খানিকটা বাঘের মাংস চাইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন এতকাল ধরে বাঘেরা যে অসংখ্য মানুষ খেয়েছে তারই প্রতিহিংসা স্বরূপ তিনি এই বাঘের মাংস খাবেন। তিনি খানিকটা বাঘের মাংস কেটে নিয়ে গেলেন এবং শোনা গেল তা রান্নাও করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মাংস তাঁর খাওয়া হয় নি।

শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার সময় এসে গেল একদিন। বিদায় মুহূর্তের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথনাথ। শূন্যতা মুখর হয়ে উঠেছে সে বর্ণনায়।

প্রমথনাথের বই

‘শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৯ সালে, প্রমথনাথ বিশী অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পর। অন্য দুটি গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করেছেন প্রমথনাথ তবে এটি নিছক রবীন্দ্র-জীবনী নয় আবার রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনাও নয়। প্রমথনাথ নিজে বলেছেন এটি একটি মিশ্রজাতের রচনা সমালোচনা ও জীবনী যেখানে একসঙ্গে মিশেছে। রবীন্দ্র-সৃষ্টির ঐশ্বর্যে ও নানা বৈচিত্র্যে তিনি বারবার অভিভূত হয়েছেন কিন্তু শিলাইদহে

গ্রামবাংলার পটভূমিকায় তিনি আরেক রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন যে কথা তিনি বর্তমান গ্রন্থে বলেছেন। মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের চতুর্থ দশক শিলাইদহ ও তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। এই পর্বটি নানা কারণে প্রমথনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। নিজেও তিনি ছিলেন পদ্মা-সংলগ্ন রাজশাহির মানুষ। পদ্মা ছিল তাঁরও প্রিয় নদী। তিনি তাঁর গ্রন্থটিকে তথ্যভারাক্রান্ত করতে চাননি, ‘কবিতা মানুষে জমিদারে মিলিয়ে যে-ব্যক্তিত্ব’ তাকেই ধরতে চেয়েছেন।

জমিদারির কাজে নৌকাপথে যাতায়াত অনিবার্য ছিল, মাঝে মাঝে ঝড়ঝাপটায়ও পড়তে হত। রবীন্দ্রনাথ বিপদে পড়লে ধৈর্য কখনো হারাতে না। একবার কবি চলেছেন চলনবিলের মধ্য দিয়ে, সময়টা আশ্বিন মাস। সেকালে বর্ষার সময় চলনবিল ছোটোখাটো একটা সমুদ্রের আকার ধারণ করত। আশ্বিনে ঝড়ের সময় অবস্থাটা রীতিমতো মারাত্মক হত। ১৩০৪ সালের ৯ই ও ১০ই আশ্বিন এ রকম ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন কবি। ৯ই আশ্বিন ছিল অমাবস্যা, বোট টলমল করছে। এরই মধ্যে এই দুই দিনে কবি চারটি গান লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি হল, ‘যদি বারণ কর তবে গাহিব না’ ও ‘আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।’ বোঝাই যায় মনটা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। প্রমথ বিশী বলেছেন কবির যোগী।

রবীন্দ্রনাথের ছিল মীন রাশি। মীন রাশির জ্যোতিষিক তাৎপর্য যাই হোক, মীনের দুটি গুণ রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল—সলিল প্রিয়তা ও চঞ্চলতা। ত্রিশ থেকে চল্লিশ — বয়সের এই দশটি বছর তাঁর কেটেছে জলময় মধ্যবঙ্গে — নদীতে খালেবিলে। বাড়ির থেকে বজরায় থেকেছেন বেশি। ভাসমান নৌকায় যার অবস্থিতি সে তো এমনিতেই চঞ্চল। তাছাড়া জমিদারির কাছে আজ শিলাইদহ, কাল সাজাদপুর, পরশু পরিসর, মাঝখানে হঠাৎ স্টীমারে উড়িষ্যা—কলকাতা বোলপুর তো আছেই। আর এক বাড়িতে বেশি দিন তিনি কখনোই থাকেন নি। এক শান্তিনিকেতনেই তিনি ঘনঘন বাসা বদল করতেন। সর্বোপরি বাংলাদেশের নদীর মতো আর কিছুই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি। মীনের চঞ্চলতা ও বারিপ্রিয়তা দুইই ছিল তাঁর।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে পাঠিয়েছিলেন। দশ বছরের কিছু বেশি তিনি শিলাইদহে ছিলেন যদিও সর্বদা তাঁকে নানা কাজে স্থানান্তরে যেতে হত। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি স্থায়ীভাবে সেখানে চলে আসেন কিন্তু তাঁর যোগ ছিল হয় নি শিলাইদহের সঙ্গে। কবি আগেও শিলাইদহে এসেছেন তবে এবারের কথা আলাদা। এবার এলেন কাজের ভার নিয়ে। তাঁর জীবনের চতুর্থ দশকটিকে যথার্থই শিলাইদহের দশক বলা যেতে পারে।

যে জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ গেলেন নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহি জেলার মধ্যে তা ছড়ানো। আরও কিছু জমিদারি ছিল উড়িষ্যায়। নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহি জেলার জমিদারি এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার সম্পত্তির বিবরণ ছিন্নপত্রাবলীতে আছে। বিরাহিমপুর পরগণার সদর কাছারি শিলাইদহ নদীয়া জেলায়, পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগণার সদর কাছারি সাজাদপুর গ্রাম আর রাজশাহি জেলার পতিসর গ্রামটি হচ্ছে কালীগ্রাম পরগণার সদর।

শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসর তিনটি স্থানই রবীন্দ্রকল্পনার পুষ্টিসাধনে সাহায্য করেছে। পদ্মা ও নদীময় বঙ্গ তাঁর কাব্যকে একটি বিশেষ দিকে প্ররোচিত করেছিল। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি এই নদীময় বঙ্গে না হয়ে যদি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার উষর অঞ্চলে হত তাহলে রবীন্দ্রসাহিত্য কী রূপ গ্রহণ করত সে বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন প্রমথনাথ।

তিনটি বৃহৎ পরগণা নিয়ে ছিল ঠাকুর বাবুদের জমিদারি—বিরাহিমপুর, সাজাদপুর ও পতিসর। আগে জমিদারি যখন ভাগ হয় তখন সাজাদপুর পড়েছিল গগনেন্দ্রনাথদের ভাগে। ১৯২১ সালে জমিদারি আবার ভাগ হলে শিলাইদহ ও বিরাহিমপুর পরগণা পড়ল সুরেন্দ্রনাথের অংশে আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রইল পতিসর ও কালীগ্রাম পরগণা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব ও যাতায়াতের পরিধি কমে গেল। তখন তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করল কালীগ্রাম পরগণা তথা পতিসর। এখানেই তিনি ‘স্বদেশী সমাজ’ স্থাপনের প্রয়াস করেছিলেন।

শিলাইদহের নতুন কুঠিবাড়ি ছিল বারো-তেরো বিঘা জমির উপর। কুঠিবাড়ির উত্তরে পদ্মার উপরে ছিল খেয়াঘাট। পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ির কাছে একটি বটগাছ ও বেলগাছের নিকটে বাঁধা থাকত কবির বাহন পদ্মা বোটখানি। রবীন্দ্রনাথের জন্য যে পদ্মা বোটখানি বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে সেটি তৈরি করিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ‘পদ্মা’ নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

গ্রন্থটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পদ্মার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। পদ্মা সাহিত্যিক প্রমথনাথেরও প্রিয় নদী। তিনি ওই অঞ্চলেরই মানুষ। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘পদ্মা’। এই উপন্যাসে পদ্মার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। তিনি লিখে সে কথা জানিয়েছিলেন।

এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদ্মার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। পদ্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রমথ বিশী লিখেছেন :

‘পদ্মাকে যে দেখেনি বাংলাদেশকে দেখেনি সে ; পদ্মাকে যে জানে না বাংলাদেশকে জানে না সে ; পদ্মাকে যে বোঝে নি বাংলাদেশকে বোঝেনি সে ;

যা কিছু দেখা জানা বোঝা সমস্ত সংহত এই নদীটির মতো।' পদ্মাকে বিশী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, 'যুগ্মতীরতুণীরা বন্য এবং বন্যাবহলা অসংখ্য যোগ্য সহচরী সহায় স্বচ্ছাচারিণী শিকারবিনোদে বহির্গতা মহানদী পদ্মা।' বিশী যে নিজেও একজন কবি তা সহজেই বোঝা যায়। গঙ্গার যাত্রা ছিল দেশে দেশে মুক্তি বিতরণ করে শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার দুর্বিনীত সন্তানদের মুক্তিদানের উদ্দেশে। পদ্মা মুক্তিদান করে না, মুক্ত করে। ভাগীরথী ভারতের বন্দনীয়া, আর পদ্মা ভারতের সমস্যারূপিণী। গঙ্গা শান্তি আর পদ্মা অশান্ত। সেই আদিম কাল থেকে তার যোগ্য মহাকবির জন্যে অপেক্ষা করছিল পদ্মা। অবশেষে রবীন্দ্রনাথে পেয়েছে সেই মহাকবিকে।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পদ্মাকে নিয়ে যে সব কবিতা লিখেছেন বিশীর মতে কোনোটাই তার যোগ্য নয়। পদ্মার মহাকাব্য ছিন্নপত্রাবলী। পদ্মা যেমন নদ হতে গিয়ে নদী হয়েছে ছিন্নপত্রাবলী তেমনি গদ্য হতে গিয়ে হয়েছে পদ্য। বিশী মনে করেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা ছিন্নপত্রাবলী যা পদ্মাশ্রয়ী।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির দৃষ্টিতে পদ্মাকে আর কেউ দেখে নি বছরের পর বছর, ঋতুর পরে ঋতু পদ্মাকে দেখে দেখে তিনি তার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বেশ ও বসন পদ্মার। যেমন নববর্ষায় নীল বসন, শরতে আশমানি। শীতান্তে স্বচ্ছ ডুরে আর গ্রীষ্মে বালুচরী। পদ্মার রূপের অন্ত নেই।

বলাকায় বিবৃত গতিতত্ত্বের ভাবটি ধীরে ধীরে কবির মনে বীজ থেকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠছিল। ছিন্নপত্রাবলীতে তার বিবরণ রয়েছে এবং তার মূল নিহিত পদ্মায়। যে অনুভূতি থেকে কবিত্বের বিকাশ তার প্রথম আভাস কবিচিন্তে দিয়েছে পদ্মা।

রবীন্দ্রজীবনের চতুর্থ দশকটি তাঁর কবিজীবনের সফলতম কাল। তৃতীয় দশক থেকে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ হলেও চতুর্থ দশকে যে সোনার ফসল ফলল তার তুলনা হয় না। এর মধ্যে রয়েছে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কণিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, কথা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি। এ সব ছাড়া আছে ছোটগল্পের অনেকগুলি এবং ছিন্নপত্রাবলীর পত্রগুচ্ছ। পরবর্তী প্রতিটি দশকই শুধু যে প্রচুর ফসল ফলিয়েছে তা নয়—নতুন নতুন ফসল ফলিয়েছে। তবে প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্বের দাবিতে চতুর্থকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। স্বয়ং কবিও তাই দিয়েছেন। এই দশকের পরই স্থান শেষ দশকটির। অকস্মাৎ কবিপ্রতিভার এই স্ফূরণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এই সময়ে তাঁর মানসলোকে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হল সাধারণ মানুষের বাস্তব পৃথিবী। রঘুপতি রাজসিংহ উদয়াদিত্যের জায়গায় দেখা দিল রাইচরণ, রতন, মৃন্ময়ী। মনে হয় মৃত্যুভাণ্ডে অমৃত নিয়ে অপেক্ষা করছিল এই

জনপদ। কবি এসে পৌঁছতেই তাঁর ললাটে এঁকে দিল অমৃতের টীকা।

বাংলাদেশের মতোই রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব নদীমাতৃক। গঙ্গাভীরে তাঁর জন্ম হলেও প্রথম জীবনে গঙ্গা তাঁর কাছে বাস্তবমূর্তি লাভ করেনি কারণ নদীর সঙ্গে মিলিয়ে নদীতীরস্থ জনপদকে জানবার সুযোগ ছিল না তাঁর। শুধু নদী তো আধখানা, জনপদের সঙ্গে মিলিয়ে তার পূর্ণতা। এই সময়ে লিখিত ‘নদী’ কবিতাটি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কবিতাটিকে প্রবহমান মনুষ্যজীবনের প্রতীক মনে করলে কবিতাটির প্রতি অবিচার হয় না। বিশী ছিন্নপত্রাবলীকে পদ্মাতীরবাসের মহাকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। এই কাব্যের নায়িকা পদ্মা, নায়ক রবীন্দ্রনাথ। সময় আর সুযোগ যেন খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল এই দশকটিতে। সুখ, স্বাস্থ্য, আনন্দ পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি, গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব, ভারহীন কর্মপাশ—সবই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। চলমান নৌকাবাসে জনপদ ও নদনদীর বিচিত্র পটপরিবর্তনও প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। স্বয়ং কাব্যসরস্বতী যেন তাঁর উপর ভর করেছিলেন।

জমিদারি, আশমানদারি

রবীন্দ্রনাথ বলতেন তাঁর পেশা জমিদারি আর নেশা আশমানদারি। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়সাধন করে তিনি সারা জীবন চলেছেন, তেমন বড়ো রকমের ছন্দপতন কখনো ঘটেনি। বলতে গেলে এই সমন্বয়সাধনই তাঁর সমগ্র কাব্য ও জীবন। তাঁর সমকালীন একখানি কবিতার খাতার এক পৃষ্ঠায় ছিল ‘দুই পাখী’ কবিতাটি, অন্য পৃষ্ঠায় বিরাহিমপুর পরগণার সদর খাজনার হিসাব। এমনি বাস্তব ও কল্পনার সহাবস্থান পাতার পর পাতায়। রবীন্দ্রনাথের রামপ্রসাদের মতো চাকরি খোয়াবার ভয় ছিল না কারণ তিনি ছিলেন একাধারে কবি এবং মনিব। মনিব ও কবির জমিদারি ও আশমানদারির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থখানিতে। প্রমথ বিশী হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ এই পাঁচ বছরে রবীন্দ্রনাথ ২৪৪ খানা চিঠি লিখেছেন অর্থাৎ গড়ে সপ্তাহে একখানা। তার মানে সপ্তাহে একবার করে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে ছিন্নপত্রাবলীতে। অবশ্য এই পাঁচ বছর আমাদের আলোচ্য দশকের অর্ধাংশ মাত্র। তবে তাতে নিশ্চয়ই একটা ধারণা করে নেওয়া যায়।

খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত থাকেন নি। সহৃদয়তার সঙ্গে গাঁয়ের লোকের সুখদুঃখের কথা ভেবেছেন। সংসার বিচিত্র। এখানে সুখ দুঃখ মহত্ত্ব নীচতা এ ওর গায়ে এসে পড়ে। কতরকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বজরা চলে। গৃহস্থের উঠোনে জল প্রবেশ করেছে, গৃহস্থ বধূরা কাঁথা মাদুর কাচছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা জলের সন্ধ্যা স্নান করছে। একটি ছোটো

মেয়েকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৌকোয় তুলে দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ একটি ছেলের মনে অকাল বৈরাগ্য দেখা দেওয়ায় সে সঙ্গীদের ছেড়ে দূরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অমায়িক পোস্টমাস্টারটি নিজে চিঠি দিয়ে যায়। কবির মতো সেও প্রবাসী। ওইখানে দুজনের হৃদয় স্পর্শ করে। মৃন্ময়ী, ফটিক আর পোস্টমাস্টারের ছবি মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। খাঁচার পাখি ও বনের পাখির লীলা চলতে থাকে। একজন ডাকে জমিদারির দিকে, আর একজন আশমানদারির দিকে।

আসে সরল গ্রাম্য চাষীর দল। কখনো বা কবির পালকি থামিয়ে একজন প্রজা কবিকে দুটো টাকা নজর দেয়। নিতে আপত্তি করলে বলে, আমরা না দিলে তোরা খাবি কী করে? ভবিষ্যতের 'স্বদেশী সমাজ' কবির মনে রূপ নিতে থাকে। জমিদারি ও আশমানদারির সীমানা একীভূত হয়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট এলে শিষ্টাচারের খাতিরে পোশাক ও পাগড়িতে সজ্জিত হয়ে পালকিতে চেপে দেখা করতে যেতে হয় কবিকে। আবার সন্ধ্যায় বর্ষা নামলে কবি ম্যাজিস্ট্রেটকে আহ্বান করে পাঠান তাঁবু থেকে কুঠিবাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে। এ জমিদারের আর এক মূর্তি।

চোখ মেলে বাইরে তাকালে পৃথিবীকে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। তার সঙ্গে কোথাও একটা নাড়ির যোগ অনুভব করেন কবি যা দেশ-কালের সীমানা ও পার্থিব জীবনের কৃত্রিম সীমা অতিক্রম করে। বহু বছরের পরিচিত পৃথিবীর কোলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

সোনার তরী, চিত্রা আর চৈতালি কবির শিলাইদহ বাসের প্রথম পর্বের ফসল। তিনখানি কাব্যেরই মূল বিষয়বস্তু নদী, নৌকা ও মাঝি; প্রথম দু'খানিতে বর্ষার ভরা নদী, শেষের খানিতে শীতান্তের নদী। সোনার তরী কাব্যের তেতাল্লিশটি কবিতার মধ্যে তেরোটিতেই প্রাধান্য পেয়েছে নদী, সমুদ্র বা নদীতীরের গ্রাম। প্রমথ বিনী সোনার তরী কাব্যকে বলেছেন বর্ষার জলময় পৃথিবী। যেতে নাহি দিব, বসুন্ধরা ও মানসসুন্দরী সোনার তরী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রথম দুটির বিষয়বস্তু হল মাটির পৃথিবীর প্রতি গভীর আসক্তি মায়ের প্রতি শিশুর আসক্তির মতো। মাটির প্রতি এই দুর্জয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান বিষয়।

চিত্রা কাব্যে অনেক নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে যার পরিচয় পায়ো যায় অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, সিদ্ধুপারে, উর্বশী ইত্যাদি কবিতায়। এগুলি কবির নিজস্ব প্রতিভার ফল, শিলাইদহবাসের ফল নয়। কিন্তু প্রেমের অভিষেক, স্বর্গ হইতে বিদায় এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি কবিতা স্পষ্টতই স্থানীয় অভিজ্ঞতাসঞ্চার। চিত্রা মূলত নিটোল সৌন্দর্যবোধের কাব্য যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উর্বশী, জ্যোৎস্নারাত্রি, বিজয়িনী প্রভৃতি।

চৈতালি সম্বন্ধে বিনী বলেছেন কবি এবারে নদী ছেড়ে নদীতীরের গ্রামগুলির

মধ্যে প্রবেশ করেছেন। চৈতালির পদ্মার মানুষ ঘেঁষা রূপ, মধ্যাহ্নের গ্রামের রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনে লিখিত গদ্যকবিতাগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবেশের যে চেষ্টা করেছেন নিজের অগোচরে তা সার্থকভাবে করে গিয়েছেন চৈতালি কাব্যে। তিনি বলেছেন একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়েও চৈতালি কেন উপেক্ষিত তিনি জানেন না।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি প্রমথ বিশী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলাকা কাব্য রচনার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশ চিত্রকল্প সংগৃহীত হয়েছে পৃথিবীর নদী সমুদ্র জনপদ নগর কান্তার প্রান্তর পর্বত প্রভৃতি থেকে। বলাকা ও তার পরে লিখিত কাব্যসমূহের অধিকাংশ চিত্রকল্প সংগৃহীত হয়েছে আকাশ অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক এবং আলোকবর্ষে পরিমেয় মহাশূন্য থেকে।

কবিজীবনের চতুর্থ দশকের বিশেষ ফসল গল্পগুচ্ছ। শিলাইদহ অঞ্চলের নদীময় বঙ্গে তাদের জন্ম এ কথা বলা যায়। ১৮৮৪ সালে ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা এই গল্প দুটি তিনি লিখেছিলেন কিন্তু তার পরে যে সাত বছর আর লেখেন নি তাতে মনে হয় এই দুটি গল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। ১৮৯১ সালে চতুর্থ দশকে যে গল্প প্রবাহের সূত্রপাত হয় তা মাঝে মাঝে সাময়িক ছেদ সত্ত্বেও ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দেনা পাওনা, গিন্নি, রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা, ব্যবধান প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে কবির লেখনীর বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। অবশ্য পোস্টমাস্টার গল্পটি ব্যতিক্রম। কবি-কলম চিহ্নিত গল্পপ্রবাহের সূত্রপাত খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পটিতে। আগের কয়টি গল্প যে অচিহ্নিত তার কারণ তাদের মধ্যে নদীময় বঙ্গ আসে নি। তারপর থেকে এসেছে নদীময় বঙ্গ বা পদ্মানদী। পদ্মানদী বিশেষভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন, বঙ্কিম-প্রতিভার বাহন যেমন গঙ্গানদী।

বঙ্কিমের উপন্যাসে গঙ্গানদী কাহিনীর সূত্র, কখনো পট, কখনো পাত্রী। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের পট বা পাত্র পদ্মা তথা নদীময় বঙ্গ। স্বভাবতই পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ যোগ। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা ও নাটকেরও পট পল্লীপ্রকৃতি। তিনি গ্রামীণ সভ্যতার কবি। উপন্যাসগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বুনন মানবজীবন ও প্রকৃতির টানাপোড়েনে। একটি সূত্র এসেছে মানুষের সুখদুঃখ থেকে আর একটি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্য থেকে। দুটিরই প্রয়োজন। দুটি ভিন্নধর্মী সূত্রের মধ্যে সমধর্মিতা স্থাপনের ফলেই গল্প সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে।

আবার আর এক শ্রেণীর গল্প আছে যাদের মধ্যে পল্লী প্রকৃতির চেয়ে পল্লীর মানুষের ভূমিকা বড়ো। দিদি, মহামায়া, জীবিত ও মৃত প্রভৃতি গল্পের এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব গল্পের উপাদান যে কবি গ্রামজীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমতার কথাও রয়েছে।

ক্ষণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, কাহিনী (নাট্যকাব্য) ও নৈবেদ্য শিলাইদহ বাসের শেষ পর্যায়ে রচিত তবে সবগুলিতেই শিলাইদহবাসের প্রভাব স্পষ্ট নয়। ক্ষণিকা কাব্যে কবি গ্রামজীবনের অংশীদার হয়েছেন। ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়েটির কটাক্ষ, রথের মেলায় বাঁশির সুরে শিশুটির আনন্দ, সর্ষে ক্ষেতে মৌমাছিদের গুঞ্জন, নির্মল প্রভাতের স্নিগ্ধ প্রশান্তি কবিকে পেয়ে বসেছে। আষাঢ় মাসের বর্ষার দিনের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন এই পঙ্ক্তিগুলিতে : ‘পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, / দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ, / দর-দর বেগে জলে পড়ি জল / ছল-ছল উঠে বাজি রে।’ বাংলাদেশের এই চিত্রের তুলনা রবীন্দ্ররচনায়ও বেশি নেই। ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘বর্ষশেষ’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে ঝড়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কথা ও কাহিনী কাব্যের অংশের পুরাতন ভূত্য ও দুই বিঘা জমি শিলাইদহ অঞ্চলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্চার। শিল্পোৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা দুই দিক থেকেই কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে নৈবেদ্য কাব্যে শিলাইদহের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

সাধারণভাবে কেউ কবিতা লেখাকে কাজ মনে করে না। বন্ধুবান্ধবেরা আসে, গল্পগুজব হয় কিন্তু কবির সময় নষ্ট হয়। কখনও কখনও বাধ্য হয়েই কবিকে অসামাজিক হতে হয়। একবার বহরমপুরে থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হয়ে দরজায় নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছিলেন যে সকাল বেলায় দেখা হবে না। পরবর্তীকাল এই নোটিসের জন্য কৃতজ্ঞ। শিলাইদহে এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো সমস্যা হয় নি। বন্ধুবান্ধবেরা কলকাতা থেকে এতদূরে আসতে চায় না। এলেও আসে সাপ্তাহিক অতিথি হয়ে। স্ত্রী-পুত্র কখনও কলকাতায়। কখনও মেজদার কাছে মহারাষ্ট্রে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কাজের অধীন আর কাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের অধীন। শিলাইদহে তাই রবীন্দ্রনাথ লেখার অটল সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতা ছেড়ে যাওয়াটা শাপে বর হয়েছিল।

খাদ্যরসিক নিঃসঙ্গ কবির বন্ধুসঙ্গ

কবির পাকশালা একটি ছোটো নৌকা যেটি পদ্মাবোটের সঙ্গে বাঁধা থাকত। বাবুর্চি গফুর মিঞার সেখানে একাধিপত্য। একদিন রান্নার সময় কবির হাতে এল বলেদ্রনাথের ‘পশুপ্রীতি’ নামে একটি প্রবন্ধ। কবি পড়তে পড়তে দেখতে পেলেন গফুর মিঞার কবল এড়িয়ে একটা মুরগি পালাবার চেষ্টা করছে আর পিছনে ধাওয়া করছে গফুর মিঞা স্বয়ং। কবি গফুরকে ডেকে বলে দিলেন আজ

তার জন্যে মুরগির মাংস হবে না। ‘পশুপ্রীতি’ প্রবন্ধ রীতিমতো ফলপ্রদ হয়েছিল।

খাদ্যরসিক (ভোজন রসিক নন) রবীন্দ্রনাথ নানারকম খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা করতেন। প্রায়ই অনাসৃষ্টি খাদ্য তৈরি করার ফরমাশ দিয়ে মৃণালিনী দেবীকে বিরত করে তুলতেন। শীতকালে বন্ধুরা এলে খাওয়া দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত হত। খাদ্য তালিকায় ইলিশ থাকতই। তখন ইলিশ ছিল পয়সায় একটি। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য অল্পই খেতেন।

বাংলাদেশের মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্ন কাল তাঁকে ব্যাকুল করে আসছে। শ্যামল কোমল বাংলাদেশের মাধ্যাহ্নিক সৌন্দর্যে যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে বোধ করি রবীন্দ্রনাথই তার আবিষ্কর্তা, আর ছিন্নপত্রাবলীতে সঞ্চিত সেই আবিষ্কারের ফল। ‘বিশেষত এখানকার (সাজাদপুরের) দুপুরবেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখীদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘসুন্দর অবসর—সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে..... আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা।’

প্রমথনাথ বলেছেন এ দেশে কবি যেমন নিঃসঙ্গ এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। বন্ধুরা এলে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতেন এবং তাঁদের টানবার জন্যে নানারকম প্রলোভন দেখাতেন যেমন টাটকা মাছ, ব্যবসার সুযোগ, নতুন নতুন গল্প শোনানো আর তাছাড়া সন্ধ্যার পরে নিত্যনতুন গান। দ্বিজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে এসে হাসির গান শোনাতে। মাঝে মাঝে আসতেন রাজশাহির উকিল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ উকিল এবং বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিশোর বয়সের বন্ধু লোকেন পালিত তখন ছিলেন রাজশাহির জজ। লোকেনের সঙ্গপ্রত্যাশায় কবি মাঝে মাঝে রাজশাহি শহরে যান এবং তিনি এসেছেন খবর পেলেই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির জজ সাহেবের বাড়িতে ভিড় করে আসেন। এ ছাড়া কবির প্রবন্ধপাঠ, গান গাওয়া তো আছেই। মাঝে মাঝে দুই বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের কাছে চলে যান। কবির সাক্ষাতের প্রতिसাক্ষাৎ করতে শিলাইদহে আসেন দুজনেই। বন্ধু সমাগমে মজলিশি কবি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ সেন ছিলেন কবির অকৃত্রিম সুহৃৎ। প্রমথনাথের ভাষায় ভাবজীবন ও অভাবজীবনের সুরু মোটা দুটো তার জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সুপারামর্শ দিতেন রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু কবির ব্যবসায়ের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হন নি প্রিয়নাথ। অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ অন্তরে ছিলেন সাহিত্যরসিক। যৌবনে কবির সাহিত্যের নিত্যসঙ্গী ছিলেন তিনি। সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে আসতেন প্রেসিডেন্সি

কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। শনিবার সন্ধ্যায় এসে সোমবার সকালে ফিরে যেতেন। জগদীশচন্দ্রের পদ্মার চর খুব পছন্দ। একটু বেলা হলে জগদীশচন্দ্র ও বালক রথীন্দ্রনাথ কচ্ছপের ডিমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কচ্ছপের ডিম এবং মাংস জগদীশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের চুক্তি ছিল প্রতিবার এসে একটি করে নতুন গল্প শুনে যাবেন। সে চুক্তি রক্ষিত হয়েছিল তবে বেশি দিন বলবৎ ছিল বলে মনে হয় না। স্বভাবতই এই গল্পগুলি আয়তনে ছোট ছিল এবং এগুলির চলন ছিল দ্রুত। প্রমথনাথের মতে গল্পগুলি পাঠককে পরিতৃপ্ত করে না তবু এরই মধ্যে ‘শুভদৃষ্টি’ ও ‘উদ্ধার’কে ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। জগদীশচন্দ্রের কল্যাণেই এই গল্পগুলি আমরা পেয়েছি। শীতের শেষে গরম পড়লে রাতের আহার সেরে সবাই ডিঙি নৌকায় চেপে নৌকা বিহারে বেরিয়ে পড়তেন। জগদীশচন্দ্রের প্রিয় গানগুলি ফিরে ফিরে গাইতে হত। কখনো কবিকে, কখনো শ্রীমতী অমলা দাশকে। গানের বন্যা বয়ে যেত। তরুণ বয়সে শিলাইদহে যে বন্ধুসমাগম ঘটেছিল কবির কাছে তার স্মৃতি চিরদিন ছিল অমলিন।

(পরবর্তী সংখ্যায় শেষাংশ ছাপা হবে)

রবীন্দ্রচর্চায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চার দুটি প্রতিষ্ঠান

মঞ্জুলা বসু

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ভাব ও চিন্তার জগতে যে পুনর্জাগরণ ঘটেছিল তাতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই পরিবারে এমন অনেক বিরাট মাপের ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। একই পরিবারে এতজন প্রতিভাশালী পুরুষ ও নারীর জন্ম সত্যিই বিস্ময়কর। বিংশ শতাব্দীতেও সেই ধারা থেমে থাকেনি। শতাব্দীর গোড়ায় আমরা পেয়েছি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ১৯০১ সালে যার জন্ম। তাঁকে বলা যায় ঠাকুর পরিবারের শেষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শেষ হলেও যিনি অবশেষ নন, আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ। তাঁর পিতা সুধীন্দ্রনাথও একজন স্মরণীয় ব্যক্তি, তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, সাহিত্যচর্চা ও সাধনা পত্রিকা সম্পাদনার জন্য। সৌম্যেন্দ্রনাথ পরিবারের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে একজন, আবার তাঁদের মধ্যেও তিনি বিশেষ। তিনিই বংশের একমাত্র সন্তান যিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ললিত বিচরণক্ষেত্র থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে এলেন রাজনীতির ধূলিধূসরিত অঙ্গনে। ঠাকুরবাড়ির লোকেদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর, বিভিন্ন স্বদেশী কার্যকলাপে তাঁরা শুধু সহানুভূতিশীলই ছিলেন না, অর্থ ও অন্যান্য ধরনের সাহায্য জুগিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে নামেন নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও পরবর্তীকালে আরও দু'একটি ঘটনায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে খুব অল্প সময়ের জন্য। রাজনীতির লোক তাঁকে বলা যাবে না। সৌম্যেন্দ্রনাথের কাছে রাজনীতিই ছিল জীবনের প্রধান আকর্ষণ—তা সে চিন্তা ও আদর্শের স্তরেই হোক অথবা রাজনীতির বাস্তব লড়াইয়েই হোক। সেখানেও আবার তিনি গান্ধীবাদের পথ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে।

আরও একটা কারণে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারে বিশিষ্ট। তা হল তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রচর্চা করেছেন। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিকথা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পিতৃস্মৃতি। কিন্তু সেগুলি স্মৃতিচারণ, রবীন্দ্রচর্চা নয়। “রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগমে” ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের সুর, তার উৎস এসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের আলোচনার ব্যাপকতা আরও বেশি এবং তা শুধু গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সৃষ্টির বিশ্লেষণ করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে ইন্দিরা

দেবীর মতো নিভুতে, নিরালায় বসে চর্চা করার সুযোগ তাঁর ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরেও অত্যন্ত সক্রিয় একটি রাজনৈতিক জীবন তাঁর ছিল। অনেক সময় দেশের বাইরে, কখনো বা জেলে কেটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বাধীনতার পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক বন্দী। যদি রাজনীতির রূঢ় বাস্তব তাঁর সময় ও মনোযোগের এতখানি গ্রাস করে না নিত তবে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে আরও অনেক মূল্যবান কাজ তিনি করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের যোগ আজন্ম। আলোবাতাসের মতোই সহজে পরিবারের মধ্যে থেকেই তিনি এই গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন। নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, “খুব শিশু বয়স থেকেই আমি গান গাইতে পারতুম। ...বাড়ীতে তখন গানের জোয়ার বইতো ভিতরে বাইরে। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ আর দিদি রমা দুজনেই খুব ভালো গাইতেন। আমি যে কবে গান জানতুম না, বাজাতে জানতুম না সেটা আমার মনে নেই” (যাত্রী)। শিশু বয়স থেকেই ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। পরে ওস্তাদ শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে গান শিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর বয়স বছর পাঁচেক। জোড়াসাঁকো বাড়ির উঠোন ভরে গেছে লোকে। দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে কাঁধে বসিয়ে গান ধরেছেন “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”, “বাংলার মাটি বাংলার জল”, সৌম্যেন্দ্রনাথও তাঁর কাঁধের উপর বসে তাঁর সঙ্গে গান গাইছেন, এরকম ঘটনা ঘটেছে। তোড়জোড় করে শিখব বলে শেখার তাঁর দরকার হত না। দু’একবার শুনেই সুরটা গোঁথে যেত মনে। অনেক গান তাঁর মা’র কাছে শুনেও শিখেছেন। মা চাকুবালা দেবী ভালো গাইতে পারতেন। তাঁর বয়স যখন সাত-আট তখন ১১ মাঘের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ দুজনে একসঙ্গে জোড়াসাঁকোতেও গানের আসরে গেয়েছেন—“তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা”, এবং সে গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। এভাবে রবীন্দ্রসংগীত তাঁর রক্তে-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসংগীতকে তাই সব বিকৃতির থেকে রক্ষা করাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের ব্রত। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত দেশের এবং তাঁর নিজের জীবনের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাঁচিয়ে রাখবার কাজে তিনি মন দেবার সময় পাননি। কিন্তু এই কথা সব সময়েই তাঁর মনে ছিল যে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে কেননা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার তাঁকে বলেছিলেন তাঁর গানগুলোর প্রচারের ভার নিতে, সে গানের গায়কী যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে। তখন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান দেশে বেশি ছিল না, রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে সাধারণের চেতনা ও আগ্রহও এতটা সজাগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে এখনকার মত এত ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের ধারাও দেশে তৈরি হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারছেন না এই বেদনা সৌম্যেন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছে। সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা যখন তিনি বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন তখন কিছু তরুণ তাঁর সংস্পর্শে আসেন যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মূল্যায়ন এবং তার চর্চা ও প্রসারের জন্য তাঁদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রসাদ সেন, প্রশান্ত মিত্র প্রমুখ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে জানান রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে গায়নপদ্ধতির অনুসরণ চেয়েছিলেন তার বৈশিষ্ট্য ছিল উদাত্ত কণ্ঠক্ষেপণ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে। একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রসংগীত যথার্থভাবে শিক্ষা দেওয়া ও তাকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রাখার কাজ করা সম্ভব। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৫৫) মহর্ষিভবনে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে “বৈতানিক”-এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। সেদিনই সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বৈতানিক সংগীত পরিবেশন করে। এরপর থেকে মহর্ষিভবনে এবং ৪ নং এলগিন রোডে সৌম্যেন্দ্রনাথের আবাসে বৈতানিকের সংগীত শিক্ষার ক্লাস শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু, সুজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মলয় ঘোষ—এঁরাও বৈতানিকের সঙ্গে যুক্ত হন। সুমিত্রা সেন, শৈলেন দাস প্রমুখ পরবর্তীকালের প্রথিতযশা শিল্পীরা বৈতানিকে গান শিখেছেন। বৈতানিকের শুরু থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ আজীবন তার সভাপতি ছিলেন।

শুধু রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণ বা পরিবেশনেই বৈতানিকের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। সৌম্যেন্দ্রনাথ আর একটি কাজ শুরু করলেন, তা হল ব্যাখ্যা ও আলোচনা সহযোগে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা। গান যখন লোকে শোনে তখন সুরের আকর্ষণেই তারা মুগ্ধ হয় কিন্তু গানটি নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে এ সম্বন্ধে তারা সাধারণত সচেতন থাকে না। বিভিন্ন গানের বৈশিষ্ট্য, তাদের অন্তর্নিহিত মর্মকথা অনুধাবন করতে পারলে রসাস্বাদনের একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। লোকের আগ্রহ বাড়ে, তাদের উপলব্ধি গভীরতর হয়। সেজন্য গানের সুর, কথা, ভাব, ছন্দ, সবই বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই কাজই সৌম্যেন্দ্রনাথ করে গেছেন এবং তিনিই এই ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এভাবে দেশের লোকের সামনে রবীন্দ্রসংগীতকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অদ্বিতীয়। সৌম্যেন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয় কত ব্যাপক ও বিচিত্র ছিল তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকেই বোঝা যাবে :

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ, রাগরাগিণীর ধারায় রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান ও লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীতে দেশবিদেশের সুরের ধারা,

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব—গানে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও জন্মদিনের গান, রবীন্দ্রসংগীতে সুরের বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রসংগীতে ভৈরবী, রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীতি, রবীন্দ্রনাথের আনন্দতত্ত্ব ইত্যাদি।

২৫ বৈশাখ জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের যে অনুষ্ঠান হয়ে এসেছে ১৯৪৮ সাল থেকে, সৌম্যেন্দ্রনাথের ভাষণ সহযোগে বৈতানিকই তার আয়োজন করেছে। সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবিতকালে ঐ বিশেষ দিনটিতে কলকাতার রসপিপাসু নাগরিকদের ভীড় জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে ভেঙে পড়েছে। রসজ্ঞ বোদ্ধা ও সংস্কৃতি জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অনেকেই সেখানে সমবেত হয়েছেন। বলা বাহুল্য সৌম্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, সুদর্শন চেহারা, বাগ্মিতা ও সুললিত বাচনভঙ্গি এসবও ছিল লোকের আকর্ষণের মূলে।

২৫ বৈশাখের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ কত নিবিড় ছিল তা এই থেকেই বোঝা যায় যে অনুষ্ঠানের আগে যখন গানের মহড়া চলত তখন অনেক সময়ই তিনি উপস্থিত থাকতেন ও প্রয়োজন মতো ঝুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এই মহড়া চলত মহর্ষিভবনের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরে, পরবর্তীকালে ৪ নং এলগিন রোডে। তাঁর উপস্থিতি নানাভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে নিষ্ঠা ও সংযমের মূল্যবান আদর্শ স্থাপন করত। যেমন তাঁর বক্তব্য ছিল যে গায়ক বা গায়িকা শুধু গলা গিয়েই গাইবে না, তারা সচেতনভাবে গানটির মর্ম গ্রহণ করবে। অতএব গানের কথাগুলি তাদের স্মৃতিতে থাকবে। তিনি যতক্ষণ উপস্থিত থাকতেন ততক্ষণ গানের বই বা গান লেখা কাগজ সামনে রেখে গান করার প্রশ্নই ছিল না। বৈতানিকে এই ঐতিহ্যই পালিত হয়ে এসে। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে এমন কি বৈতানিকেও। আজকে খ্যাতনামা শিল্পীরা প্রায় কেউই সামনে বই বা খাতা নিয়ে না বসলে গান গাইতে সাহসই করেন না। সৌম্যেন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠতেন।

আরেকটি ব্যাপার ছিল সভার সম্ভ্রম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার শিক্ষা। সেজন্য মঞ্চে যারা উপস্থিত থাকবে তারা উপযুক্ত স্থৈর্য ও সংযমের পরিচয় দেবে যতক্ষণ সভার কাজ চলবে, এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। যতক্ষণ তিনি নিজের সভায় মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন ততক্ষণ যে অচঞ্চল ভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতেন তা সত্যিই অনুকরণ করার মত ছিল। মঞ্চে ছুটফুট করা বা কথা বলার সাহসই হতো না কারুর। অথচ অন্য অনেক জায়গাতেই প্রাথমিক এই শিক্ষাটার অভাব লক্ষ করা যায়।

সব মিলিয়ে রবীন্দ্র সংগীতকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখে তার প্রচার, লোকের মনে রসোপলব্ধির চেতনা সঞ্চারের কাজে পুরোধা ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। অন্যদিকে নিয়মনিষ্ঠা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে কীভাবে প্রতিষ্ঠান

চালানো যায় এবং সভা পরিচালনার সুষ্ঠু ও শালীন আদর্শ স্থাপন করা যায় তারই নিদর্শন তিনি বৈতানিকের মধ্যে রেখে গেছেন। স্বভাবশিথিল বাঙালীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতাকে কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু বৈতানিকের সভা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে শুরু হত। পরবর্তীকালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট যখন প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার সূচনাকালে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ, তখন উপরের ঐতিহ্যগুলির কথা সব সময়েই প্রতিষ্ঠাতাদের মনে ছিল এবং তারা সেগুলি যথাসাধ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন।

১৯৪৮ সালের সতেরো বছর পরে ১৯৬৫ সালে ১ জানুয়ারি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, একান্তভাবেই সৌমেন্দ্রনাথ বসুর। দীর্ঘকাল বৈতানিকের সঙ্গে যুক্ত থাকতে থাকতে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন যে যাঁরা গান করেন তাঁরা অধিকাংশ সময়ই গানের কথা ও তার অর্থ সম্বন্ধে সচেতন নন। একথাও তাঁর মনে হয়েছে দেশ জুড়ে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে বিপুল আড়ম্বরে অনুষ্ঠানের আয়োজন হল তাতে রবীন্দ্রসৃষ্টির রসের দিকটাই প্রাধান্য পেল, তাঁর মননের দিকটি নয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিলেন যে দেশের লোকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমগ্রতায় পৌঁছে দিতে হবে। বস্তুত বৈতানিক ও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হলেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে পরস্পরের পরিপূরক। ১৯৬৫ সালের পয়লা জানুয়ারি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৪ নং এলগিন রোডস্থ আবাসে সৌমেন্দ্রনাথ বসু একটি সভা আহ্বান করেন। যেদিন কবি নরেন্দ্র দেব, প্রাক্তন বিপ্লবী ও পরে কংগ্রেসের সদস্য এবং মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, কবি-সাংবাদিক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, বৈতানিকের সম্পাদক প্রশান্ত মিত্র, প্রবীণ বিপ্লবী প্রভাত সেন প্রমুখ উল্লেখ করবার মতো অনেক মানুষই উপস্থিত ছিলেন। সেদিনই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করার জন্য টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সূচনা হল।

সেই সময় সৌমেন্দ্রনাথ দেশে ছিলেন না, তিনি তখন ইউরোপে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর যে আন্তরিক সমর্থন থাকবে সে বিষয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের কোনো সংশয়ই ছিল না। কার্যত হলও তাই। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে সৌমেন্দ্রনাথ বসু যখন বিদেশে চিঠি লিখলেন, সৌমেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লিখলেন : “তোমরা কোমর বেঁধে কাজে নেমেছ দেখে আমি খুব খুশি। যে কোন কাজই করো না কেন প্রাণ ঢেলে করো এই আমি চাই। দলাদলি, পরস্পরের সম্বন্ধে বক্রোক্তি, ঈর্ষা — এই বিষাক্ত বাষ্প মধ্যবিস্তৃত শিক্ষিতদের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাই কতো সম্ভাবনা যে নষ্ট হয়ে গেল বাংলাদেশে তা বলা যায় না।”

প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রভাত সেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম থেকেই

সৌম্যেন্দ্রনাথকে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজেই ঐ পদ থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁর নিজের বাড়ির চত্বরে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সভাপতি থাকাটা তাঁর কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি। সেইজন্য অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক চক্রবর্তীও বেশিদিন সভাপতির পদে থাকতে চাননি বলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ইনস্টিটিউটে যোগদান করলেন। তখন তাঁকেই সভাপতি করা হল। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে সৌম্যেন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন এবং ইনস্টিটিউটের কাছে তাঁর কী প্রত্যাশা ছিল তা বোঝা যাবে ১৯৬৮ সালে ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে তিনি যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন তার থেকে। সেই ভাষণের অংশবিশেষ নীচে তুলে দিচ্ছি।

...রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে জানতে হলে তাঁর সত্তার ভিত্তি ও তাঁর সত্তার বিচিত্র প্রকাশ-লীলাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাষা ভাষা ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একপেশে ধারণা করে নিয়ে আমরা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির রস-লাভ কিংবা বিচার করতে প্রবৃত্ত হই। এই সফরীপনা সমকালীন বুদ্ধির বাজারে বাহবা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তা, সাধনা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে ‘টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের’ প্রতিষ্ঠা। এই পাঠচক্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে নবযুগ-চেতনার উন্মেষ হয়েছিলো সেই সূচনা থেকে শুরু করে রবীন্দ্র প্রতিভা-জাত প্রতিটি সৃষ্টির অনুশীলন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, সামাজিক রচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, জীবনতত্ত্ব, অর্থনৈতিক মতবাদ, আনন্দমীমাংসাতত্ত্ব, মানবতাবাদ ও বিশ্বাত্মবাদ—এইসব বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন-কেন্দ্র এই ‘টেগোর-রিসার্চ-ইনস্টিটিউট’।

...পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সেই দেশের মহৎ স্রষ্টার জীবন ও সাধনা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য এক একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান রচিত হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এক মাত্র সেই মনীষীর জীবন সৃষ্টি ও কার্যকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক গবেষণা করে থাকে। ইংলণ্ডে শেক্সপীয়ারের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করবার জন্য ঐ ধরনের একটি অনুশীলন কেন্দ্র বহুদিন থেকে কাজ করে চলেছে। জার্মানীতে মহাকবি গ্যেটেকে কেন্দ্র করে এই ধরনের একটি গবেষণা-কেন্দ্র আছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান এতদিন গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেশে “টেগোর ইনস্টিটিউট”-ই সূচনাকার ও প্রথম ব্রতী এই বিষয়ে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। বিভিন্ন সভায় তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। ইনস্টিটিউটের ক্লাস ঠিকমতো চলছে কিনা, কে ক্লাস নিচ্ছেন, কী পড়াচ্ছেন সব বিষয়ে তিনি খুঁটিয়ে সংবাদ নিতেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে যে দীনবন্ধু অ্যাড্জু জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন হয় তাতে সৌম্যেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইনস্টিটিউট রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে তাঁকে “রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য” উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সম্পর্ক ছিল হয়ে গিয়েছিল। ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় যারা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের মত পার্থক্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইনস্টিটিউট ৪ নং এলগিন রোডের গৃহ ছেড়ে স্বতন্ত্র আবাস খুঁজে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭৩ সালে। দুর্ভাগ্যবশত সৌম্যেন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাকশক্তি লোপ পায়। তিনি সুস্থ শরীরে আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে কী ঘটত বলা যায় না, তবে তখনকার পরিস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছিল সম্পর্কের যোগসূত্রকে আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বাইরের ঘটনা যাই ঘটুক রবীন্দ্রচর্চার প্রতি যে সৌম্যেন্দ্রনাথের অন্তরের টান ছিল সে সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তাঁর রবীন্দ্রচর্চার ফসল হিসাবে কয়েকটি বইয়ের নাম করা যায় যেমন, “রবীন্দ্রনাথের গান”, ‘রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা’, ‘The Poet’s Philosophy of Life’। এছাড়া আছে বহু প্রবন্ধ। মনে রাখতে হবে তাঁর এই সব লেখাই পরিণত বয়সের ফসল। এর আগে তিনি অনেক লিখেছেন, কিন্তু সে সবই রাজনীতি বিষয়ে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কাছে যে রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন “রবীন্দ্রনাথের গান”-এ। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনের Tagore Centenary Number-এ তিনি Rabindranath Tagore’s Contribution to Indian Music বলে যে প্রবন্ধ লেখেন তা প্রাসঙ্গিক বলে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

Rabindranath Tagore introduced in Indian music a new note which, till then, was completely unknown. His songs gave expression to the moods of the flowing moments of life.

.....In Indian classical music which is impersonal there is not much scope for variation or for the autonomy of personal emotions within the strict boundaries of personal abstractions.

.....Indian music received from the hands of Rabindranath Tagore the superior gift of freedom from the prison-house of impersonal abstraction, and became humanised.

.....Indian music which in the course of centuries had become sophisticated and static, once more was enlivened with the dramatic life-current emerging from the creative contributions of a master-composer.

(Presidency College Autumn Annual
Vol II 1961

Tagore Centenary Number)

রবীন্দ্রসংগীত তাঁর প্রাণের বড়ো প্রিয় জিনিস ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ক্রমশ রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি নিয়ে যে যথেষ্টাচার শুরু হয়, কোনো কারণ না দেখিয়ে স্বরলিপির পরিবর্তন ঘটতে থাকে, কাঙালীচরণ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের করা স্বরলিপি বাতিল হয়ে যায় ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ভাষণ ও লেখায় নানা জায়গায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৩৭৬ সালের বৈশাখে “গীতবিতানের” বিংশ বার্ষিক সমাবর্তনে তাঁর ভাষণে তিনি বলেন :

সম্প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনন্যতার উপর আক্রমণ চলেছে নানাদিক থেকে। যারা বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচালক তাঁরা তাঁদের খুশিমত রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুর বদল করে দিচ্ছেন, কোথাও কোথাও শব্দও। ...এই অশোভন আচরণকে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ধর্ষণ যাতে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগ থেকে না হয় সে সম্বন্ধে অবহিত হোন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ বৈশাখ ১৩৭৬)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সৌম্যেন্দ্রনাথের ভক্তি ও ভালোবাসা অঙ্ক স্তাবকতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কোনো কাজ বা বক্তব্য সমর্থন করতে না পারলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন ‘নমো যন্ত নমো যন্ত’। সৌম্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বললেন, তুমি তো শুধু যন্ত্রের বন্দনা করেছ, মানুষের নয়। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন ‘ওই মহামানব আসে।’ রবীন্দ্রনাথকে এমন ভর্ৎসনা একমাত্র সৌম্যেন্দ্রনাথই করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'

শ্রীলা বসু

॥ ১ ॥

নাটক আমরা লিখতে পারি নি। ও মন আমাদের নয়, অর্থাৎ নাটকের যেটা প্রধান গ্রন্থি, যেগুলো দিয়ে সত্যি করে তোলে নাটককে – সে ঠিক আমাদের আয়ত্তে আসে না।... আমরা নাটকে অন্তত একটা কল্পলোকের ছায়া আছে : একটা কোণ অধিকার করেছি মাত্র।'

নাট্যকারের 'মন' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? রানী চন্দের সঙ্গে এই আলাপচারিতায় একটু আগে রবীন্দ্রনাথ নিজের গৌরবের ফসলগুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন তাঁর গান আর ছোটোগল্পের কথা। নিজের নাটক বিষয়ে তাঁর কুষ্ঠার উদাহরণ আছে অন্যত্রও। উপরের উৎকলনটিতে 'আমাদের' শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় যে এ কুষ্ঠার কিছুটা ব্যক্তিগত, কিছুটা জাতিগতও। বাঙালি নাট্যকারের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় নাট্য বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর একাত্মতা বা সাব্জেকটিভ প্রবণতা – সাধারণত যা নাট্যস্বন্দ্র ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে প্রতিকূল। উপরন্তু আছে নাট্যপ্রবাহে মত্ততার অভিযোগ।

এ কথা ঠিকই যে মহৎ সাহিত্যের মধ্যে চমক, এমনকি বৈচিত্র্যের ভাগটাও অনেক সময় কমই থাকে কারণ সচরাচর তা মন্দগতি জীবনের প্রতিভাস। আর শিল্পীর জীবনদর্শনে যদি সত্যিকারের গভীরতা থাকে তাহলে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পুনরাবৃত্তি থাকবেই। জীবন প্রসঙ্গে দিনে দিনে তাঁর মত বদলায় না। এই পুনরাবৃত্তিও কখনো কখনো বৈচিত্র্যের পরিপন্থী। কিন্তু নাটক এমন একটি শিল্পমাধ্যম যা অন্তত বহিরাঙ্গিক ভাবে দাবি করে নানা উত্থানপতন।

নাটকের উপাদানে নানারকম বৈচিত্র্য থাকবে অথচ ডুব দিলে পাব শাস্বত সত্যের সন্ধান, শেক্সপিয়র-সুলভ এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ নয়। শিক্ষানবিশ পর্বের পর রবীন্দ্রনাথে আর সে পথে যানওনি। তাঁর নিজস্ব নাট্যগত মাতৃভাষার সন্ধানও জরুরি ছিল। *বিসর্জন*-এর পর থেকে 'ঘটনার ঘনঘটা'র ঠাসবুনন ছেড়ে, ক্রমশ তদ্ভাংশ বাড়তে-বাড়তে রবীন্দ্রনাটক যেখানে পৌঁছয়, সেখানে 'তত্ত্বনাট্য' শিরোনামটি নির্দিষ্টায় মূল ধারার রবীন্দ্রনাটকের পরিচয়পত্র হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নাটকে ঘটনা চরিত্র পরিবেশ ইত্যাদির প্রচ্ছদসজ্জা যতই নতুনতর হোক, নাটকের বক্তব্য বা অভিপ্রায়ের মূল লক্ষ্যে কিন্তু বড়ো রকমের জাতবদল রবীন্দ্রনাথ ঘটাননি। তত্ত্বগত বিচারে জড়শক্তি আর প্রাণের বিরোধই সব

রবীন্দ্রনাটকের অন্যতম অভিপ্রায় — এক কথায় এমন মন্তব্য করতে পারেন সমালোচকরা।^২

আবার যখন দেখি একই রকম ‘টাইপ’ চরিত্রেরা বারবার ঘোরাফেরা করে রবীন্দ্রনাটকে তখন আবারো মনে পড়ে নাট্যকারের বিশ্বাসের জগতের একনিষ্ঠতার কথা। কতবার এসেছে কবি চরিত্র রবীন্দ্রনাটকে? রুদ্রচণ্ডর চাঁদ কবিতাে যার সূচনা (গাথাকাব্যে কবিকাহিনী, বনফুল-এর কবি তো আরো পুরোনো) পরিণত পর্বে ফাল্গুনী, ঋণশোধ, বসন্ত, রথযাত্রায় তাদের বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন রূপ। শুধু কবি নয়, সন্ন্যাসী, ঠাকুরদাদা এবং পাগল বহু নাটকে ব্যবহৃত এই চরিত্রগুলি নিজেদের পুনরাবৃত্ত অস্তিত্বে কেমন ক্রমশ প্রতীক হয়ে উঠেছে, এ নিয়েও আগে আলোচনা করা হয়েছে।^৩ এই চার ধরনের চরিত্রের বক্তব্যে এবং আচরণে বারবার এক রকমের স্বরের প্রক্ষেপণ শুনি আমরা। সেকি নাট্যকারেরই কণ্ঠস্বর?

॥ ২ ॥

বাঙালির হাতে উপন্যাস রচনার গোড়ার পর্বে সমসাময়িক সমাজ জুগিয়েছে নকশা জাতীয় ব্যঙ্গরচনার খোরাক। আর নিটোল কাহিনির নভেলি মডেলটি তৈরি করে দিয়েছে প্রধানত ইতিহাসের উপাদান। বঙ্কিমচন্দ্রের সাজিয়ে দেওয়া এই মডেলে একুশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের বিষয়ও ঐতিহাসিক ; রাজবৃত্ত কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজচরিত্র ‘বউঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩)-এর অত্যাচারী প্রতাপাদিত্য ছাব্বিশ বছর পরের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০৯) বা আরো কুড়ি বছর পরের নাটক ‘পরিত্রাণ’ (১৯২৯)-এ ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিছুটা অপ্রত্যক্ষভাবে ‘মুক্তধারা’র (১৯২২)-র গজিতেও তারই ছায়াপাত।

কথাসাহিত্যের পৃথিবীতে জন্ম রবীন্দ্রনাথের যে দুই রাজার সেই প্রতাপাদিত্য আর গোবিন্দমাণিক্যকে নাট্য রূপান্তরে পেয়েছি আমরা। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই আমরা পেয়েছি কোনো না কোনো রাজাচরিত্র। সাদৃশ্য কখনো কখনো থাকলেও রাজার প্রতিমায় বিপরীতমুখিনতাও কম নয়। বিক্রমদেবের সঙ্গে কীভাবে মেলাব আমরা ‘ডাকঘর’-এর নেপথ্যচারী রাজাকে? অপার্থিব জগতের রাজা যাঁরা, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনার ফসল, তাঁদের মধ্যে বৈচিত্র্য ত্রেন নেই, আছে তত্ত্বের উদ্ভাসন। কিন্তু যাঁরা পার্থিব জগতের রাজা? — বৈচিত্র্যের প্রত্যাশিত অবকাশ সেখানেই। বিভিন্ন সময়ের এই বিচিত্র রাজাদের মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের একটা রেখাও ধরা পড়ে। ‘ডাকঘর’ ‘রাজা’ ‘অরুণপরতন’-এর অতিলৌকিক বা মিস্টিক মহারাজদের বাদ দিয়েও মাটির পৃথিবীর রাজাদের কীভাবে দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? বিভিন্ন সময়ের

নানা নাটকের মধ্যে দিয়ে এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর পেতে পারি। আর এ ভাবে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাটকের চালচিত্রে আদর্শ রাজার প্রতিমাটি।

॥ ৩ ॥

জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভেতরমহলের ছাদে শীতের দুপুরে নতুন বৌঠানের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের যে মজলিশ বসত তাতে আমসত্ত্ব পাহারা বা সুপুরি কাটার সঙ্গে সঙ্গে বৌঠানকে বই পড়ে শোনার রেওয়াজও ছিল। সেই মজলিশেই পড়া হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র ঘোষের *বঙ্গাধিপ পরাজয়*^৪ (প্রথমখণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪)। হয়তো সেই প্রথমবার ইতিহাসের এই রাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। স্বাভাৱ্যভিমানের এক রোখা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বা আরো পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদরা (*বঙ্গের প্রতাপাদিত্য* নাটক ১৩১৩) যে আদর্শ বীরের প্রতিমা তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস ঘেঁটে তার নিষ্ঠুরতার দিকটা মেলে ধরলেন। একেবারে পথিকৃৎ অবশ্য নন রবীন্দ্রনাথ, উনিশ শতকের প্রথমে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য (১৮০১) আখ্যায়িকাটিতে প্রতাপের নিরপেক্ষ বর্ণনা আছে। যা হোক, *বঙ্গাধিপ পরাজয়*-এর পর প্রতাপ চরিত্রের প্রচলিত মহিমাবিত্ত আবহে রবীন্দ্রনাথ ছন্দপতন ঘটালেন, নিন্দিতও হলেন সেজন্য।

বউঠাকুরানীর হাট ও নাট্যরূপান্তর প্রায়শ্চিত্ত-র কেন্দ্রে যে বিরোধ তাতে প্রতাপাদিত্যের প্রতিপক্ষ প্রত্যক্ষত উদয়াদিত্য আর বসন্ত রায়। অপ্রত্যক্ষভাবে সুরমা আর বিভা। শেষ চারজনের প্রেমের ভুবনে রাজার প্রতাপ যেন এক মূর্তিমান দুষ্টগ্রহ। ইতিহাস থেকে চরিত্রটি এবং তার নাম গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু *বউঠাকুরানীর হাট প্রায়শ্চিত্ত পরিত্রাণ*-এ প্রেমের প্রতিপক্ষ আক্ষরিক অর্থেই প্রতাপ। আর এক আশ্চর্য সমাপতনে পরে রবীন্দ্রনাথ *বিসর্জন*কে প্রেমপ্রতাপের দ্বন্দ্বের নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন যা ব্যাপকতর অর্থে তাঁর সব নাটকের মূল তত্ত্বগত বিষয়।

নাটকের বহিরঙ্গ্রে একটা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কথা আছে। পিতার রাজকীয় প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারছে না যুবরাজ, ফলে পিতা হয়েছেন ক্রুদ্ধ এবং পুত্র ক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত। এ যেন ঠাকুরবাড়ির কিশোর রবীন্দ্রনাথেরই আত্মপ্রক্ষেপ — যিনি, দীপ্তিমান দাদাদের সমারোহে স্নান, স্বজনমহলের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ — যার ক্ষোভের পরোক্ষ প্রকাশ *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত *অভিলাষ* কবিতা।

কিন্তু রাজত্ব বা রাজাপ্রজা সম্পর্ক নিয়ে পিতাপুত্রের ভাববার ধরনটাই পৃথক। এবং সেইখানেই নাটকটি আর পারিবারিক বৃন্তে আবদ্ধ থাকছে না। নাটকের বহিরঙ্গ্রে ঘটনার নানা রকম ঘনঘটা থাকলেও নাটকের চারিত্রগত দ্বন্দ্বের বীজ এখানেই। এই কাহিনী কাঠামোর ঐষৎ পরিবর্তিত ফসল *মুক্তধারার* ও শেষ নাটক *পরিত্রাণ*-এ প্রজাভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে আরো বেশি।

যুবরাজের সামনে আদর্শের মডেল হিসেবে কাজ করছে রায়গড় নৃপতি বসন্তরায়ের শাসন পন্থা। সেখানে প্রজাপালনের সুরটা সৌহার্দ্যের, স্নেহমিশ্রিত প্রশয়ের। প্রতাপাদিত্য যে প্রচলনকে ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘যশোহর রায়গড় নহে ; এখানে প্রজাদের গুরুত্ব নাই, এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে।’ শুধু বসন্ত রায় নয়, স্ত্রী সুরমাও ‘রাজার ছেলের উপযুক্ত’ প্রজাপালনের দায়িত্ব স্বরণ করিয়ে দেয় উদয়াদিত্যকে, প্রায়শ্চিত্ত-র সর্বপ্রথম দৃশ্যে। প্রতাপাদিত্যও নিজের বিশ্বাস মতে রাজকর্তব্য সচেতন, কিন্তু তাঁর কর্তব্য শাসনের নামে অত্যাচার পর্যন্তই সীমিত। রাজা আর যুবরাজের রাজদায়িত্ব পালনের মাপটাই আলাদা। যদিও পিতৃহৃদয় আর রাজহৃদয়ের দ্বন্দের পরিচয় পরিত্রাণ-এ আছে তবু কার্যক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্য কন্যার বৈধব্যের মূল্যেও রাজাস্তঃপুরের মর্যাদা রক্ষা করতে রাজি।

পরিত্রাণ-এর প্রতাপাদিত্য স্বকপোলকল্পিত অচলায়তন ভাঙবার কথা ভাবেননি। কিন্তু সময়ের ক্রম ভঙ্গ করে প্রায়শ্চিত্ত-এর প্রতাপাদিত্যের মধ্যে অন্তত একবার দেখতে পাই ভাঙনের হঠাৎ আলোর ঝলকানি। গারদে বন্দী হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগী, আলোচ্য দৃশ্যে সেখান থেকেও নিখোঁজ। রাজা প্রতাপাদিত্য তার সঙ্গে দেখা করতে চান। মন্ত্রী প্রয়োজন শুধোলে তাকে বলেন ‘সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম — তার কথা শুনতে মজা আছে।’ কিন্তু তার ঠিক পরেই ধনঞ্জয়কে সামনাসামনি পেয়ে ‘ভাঁড়ের’ সঙ্গে রাজার কথোপকথনের সময় স্বরভঙ্গিতে নেই কোনো শ্লেষের বা অসম্মানের সুর। বরং ধনঞ্জয় পথের আনন্দগান শুনে অকস্মাৎ খুলে যায় রাজার মনের কপাট। বলেন — ‘বৈরাগী আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাটাই ভালো আমার এই রাজ্যটা কিছু না।’ ধনঞ্জয় বলে — ‘মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক — আমরা কোথায় লাগি!’

রবীন্দ্রনাথের অনেক রাজার মধ্যেই বন্ধনমুক্ত হবার প্রয়াস, এমনকি নিষ্ঠুর অত্যাচারী প্রতাপাদিত্যের মধ্যেও তারই আকাঙ্ক্ষা দেখি, একবার মাত্র চকিতে। পরের নাটক পরিত্রাণ-এ প্রতাপ চরিত্রের এই আশ্চর্য মোচড়টি একবারও স্পর্শিতও হয়নি।

প্রতাপাদিত্য তার দোষগুণ যেমনই হোক, নিজের রাজ অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিক্রম যেন দৈব-দুর্বিপাকে রাজ্য হয়ে গেছে। এ যেন এক বিষম বিড়ম্বনা! রাজা ভুলে যান তাঁর কর্তব্য, কৈশোরের রাজবালকের খেলাঘরেই দিন কাটাতে চান, কিন্তু রানি ভোলেন না তাঁর কর্তব্য। রাজাকে বারবার মনে করিয়ে দেন সে

কথা, অনেকটা যেমন করে সুরমা যুবরাজকে প্রজাপালনে উৎসাহ দেয়। রাজার কাছে অশুঃপুরের বিবরই প্রেয়তর আর এই নিয়েই ঘনিয়ে আসে রাজা-রানির দূরত্ব ক্রমশ ভুল বোঝাবুঝি এবং ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদ। যদিও প্রেমের অভাব ছিল না কারোরই।

প্রতাপাদিত্যের নাম থেকে শুরু করে সমস্ত আচরণে রাজার প্রতাপের যে মুখচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে একগুঁয়ে নিষ্ঠুরতার অংশটাই প্রধানতম। কিন্তু সদর্থক ভাবে রাজার প্রতাপের ঔজ্জ্বল্য দেখতে চায় জলন্ধর রাজ্যের শুভার্থীরা। রানির আত্মীয়রা রাজার ক্ষমতার ভাগ করে নিয়েছে, অপব্যবহার ঘটিয়েছে তার, মন্ত্রী বলেন

রাজার প্রতাপ

ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি

বিশ্বচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম। (১/১)

রানি রাজ অবহেলা দেখে লজ্জায়, আক্ষেপে বলেন—

এ যে মেঘের মতন

রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে

উজ্জ্বল প্রতাপ তব। (১/৪)

কিন্তু রাজার উচ্চারণে দেখি প্রতাপ রূপকল্পের বিপরীত প্রয়োগ। সুমিত্রার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বিক্রমদেব বলেন—

বৃহৎ প্রতাপ

লোকবল অর্থবল নিয়ে পড়ে থাকে

শূন্য স্বর্ণ পিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি

উড়ে চলে যায়। (২/৪)

রানি বা মন্ত্রীর কাছে যা মেঘাচ্ছন্ন বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজার কাছে তাই-ই ‘বৃহৎ’, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। নিজের অতিপ্রেমের কারাগারে বন্দী এবং আহত বিক্রমদেব পরে সংহার খেলায় মেতেছেন। যে ‘প্রতাপ’ রাজার মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন রাজমন্ত্রী বা রানি, তাকে পাওয়া গেল না, বিক্রমের অন্তর্হীন যুদ্ধপর্বে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে হিংসার রূপকল্প। রেবতীর ক্রুরতা দেখে বিক্রম যখন সম্বিং ফিরে পান, কাশ্মীর মহারানির মুখের প্রতিফুলনায় নিজেকে মিলিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ভাবেন—

রুদ্ধ হিংসাভরে

অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে? (৫/৫)

পরে নিজের আচরণ আর রেবতীর হিংসার গোপনচারিতা এই দুইকে -আলাদা করেন, কারণ

এ হিংসা আমার

চোর নহে, কুর নহে, নহে ছদ্মবেশী (৫/৫)

এক হিসেবে রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাটকের শোভাযাত্রায় একক। ‘প্রতাপ’ শব্দটিকে যে অভ্যেসে ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, ‘প্রেম প্রতাপের দ্বন্দ্ব’ বা এই জাতীয় অন্য নানা উল্লেখ, এখানে তার বিপরীতমাত্রিক প্রয়োগ। বিক্রমদেবের সমস্যা তার মাত্রাবোধের অভাব, প্রেমের ক্ষেত্রে, হিংসারও ক্ষেত্রে। তার সহজেই ভেসে গিয়ে প্রান্তিক আচরণে পৌঁছবার দিকেই ঝোক। তাই রানির বাঞ্ছিত রাজার প্রতাপ আর পাই না আমরা ; রাজার প্রতাপের অমিতব্যয়িতার অপব্যবহারে হিংসার মরণনৃত্য চলে।

বোঝা যায়, রাজা ও রানীর মতো গোড়ার দিকেই নাটকে তত্ত্বগুণ দানা বেঁধে ওঠেনি। রূপান্তরিত গদ্যনাটক তপতীতে অন্তত রানির চরিত্রকল্পায় যেমন পূর্বনির্ধারিত ভাবের নির্দেশ রয়েছে, তেমন নেই নাটকটিতে। তবে রাজার চরিত্রের মানবমূল্য হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, যদিও তাঁর প্রচণ্ড আবেগময়তা গদ্যসংলাপে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

বিক্রমদেব নয়, রাজা ও রানীর কাশ্মীর যুবরাজ প্রজাবৎসল কুমার সেন পেয়েছিলেন প্রজার ভালোবাসা। ত্রিচূড়কন্যা ইলার ভালোবাসা ছিল তাঁর সহায়, তাঁর কর্তব্যের সচিব। রাজা ও রানীর জনতা চরিত্রের মুখে বারবারই গুনতে পাই কুমারের প্রশংসা, ইলা বলে ‘সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে / হৃদয়’। পলাতক অবস্থায় বনযাপনের সময় কুমারও প্রসন্ন থাকেন প্রজাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় — ‘অযাচিত / ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি-সম / অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারিদিকে / ভক্ত প্রজাগণ’। রাজা নয়, রাজেন্দ্রনন্দিনী, চিত্রাঙ্গদাও প্রজাদের বিশ্বাস ভরসার এমনই এক কেন্দ্র — ‘এক দেহে / তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের / স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ’।

॥ ৫ ॥

রাজা ও রানী আর বিসর্জন-এর মধ্যে কালগত ব্যবধান একবছরের মাত্র। কিন্তু আমরা বিসর্জনকে বলতে পারি শেক্সপিয়র প্রভাবিত নাট্যবিন্যাস আর পরবর্তীকালের ‘টিপিকাল’ রবীন্দ্রনাটকগুলির যোগাযোগের প্রথম সাঁকো। নাটকের বহিঃস্থ বিন্যাসে (বিশেষ করে রঘুপতির মতো ট্রাজিক চরিত্র কল্পনায়) সংঘাতের উপাদান প্রচুর, তার স্তরও নানামাত্রিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিসর্জন-এর নাট্যমূল্য অস্বীকার করে জনৈক সমালোচক নাটকটিকে চিহ্নিত করেছিলেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ‘thesis’ মাত্র বলে^৫। অবশ্যই এরকম মতামতের পরিধিতেই আমরা আটকে থাকব না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে মারাত্মক নাট্যগুণ বা রঘুপতির মতো দার্ঢ্যময় অথচ করুণ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও বিসর্জন সম্পর্কে বারবার ওঠে তদ্ব্যয়িত হওয়ার কথা। নাট্যকারের নিজের ব্যাখ্যাসূত্র — ‘প্রেমপ্রতাপের দ্বন্দ্বের নাটক’, — আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য অতিসরলীকৃত হলেও একেবারে উড়িয়ে

দেওয়া যায় না। বিপরীত ভাবনার মানুষগুলির বিরোধে তো বটেই এমনকি একা রঘুপতির মধ্যে কেমনভাবে প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব বেধেছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে^৬।

আসলে তত্ত্বের কথা এত বেশি করে ওঠে গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রটির জন্য। রাজর্ষি উপন্যাসের নামকরণে যাকে প্রধানতম বলে স্বীকার করা হয়েছিল, তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সূত্র ধরে উপন্যাসটি সাজানো। কিন্তু সে সজ্জারচনার মধ্যে ছিল ‘মাসিক পত্রের পেটুক দাবি’^৭, তার দৈর্ঘ্য শিল্প ঐক্যকে ব্যাহত করেছে। *বিসর্জন* অনেক পরিমার্জিত নাট্যরূপ। নাটকের প্রধান কেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট থীম, উপন্যাসের মতো চরিত্র নয়। নাটকে প্রতিমা বিসর্জন, সেই সঙ্গে বিসর্জিত হল রঘুপতির ভ্রান্ত ধর্মবুদ্ধি। পরাজয় ঘটল বহু আলোচিত সেই প্রতাপেরও। উপন্যাসটির গঠন তুলনায় অনেক এলোমেলো, এরকম একৈক্যমুখি নয়।

রাজর্ষিতে নক্ষত্রমাণিক্য আর রঘুপতি নগরের সৈন্যের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করবার জন্য এলে গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যত্যাগ করে চলে যান। নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্য যখন আরাকান রাজ্যে ময়ালি নদীর ধারে কুটির বেঁধে বাস শুরু করেন তখন তাঁর এই জীবনযাপন সম্পর্কে কেমন ছিল কথকের মতামত?

রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্যপরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আজন্মকালের ছোটো ছোটো অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না। (রাজর্ষি)

অনেক আত্মভর্ৎসনায় গোবিন্দমাণিক্যের দৈনন্দিন সুখাভ্যাস কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, সে উল্লেখও উপন্যাসে আছে।

বিসর্জন-এর রাজাকে যতই বলি নাট্যকারের মুখপাত্র বা অভিপ্রায়ের ধারক ইত্যাদি, তবু রাজার এই সর্বস্বত্যাগের বিবরণ নাটকে নেই। নেই রাজার আক্ষরিক অর্থে রাজর্ষি হয়ে ওঠবার রূপরেখাও, — ঘটনার গতি অতদূর গড়ায়নি। *বিসর্জন*-এর গোবিন্দমাণিক্যকে অনেক বিরোধ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। শুধু রাজসভায় নয় অশুংপুরের এই পরীক্ষায় আর একবার প্রমাণিত হয়েছে রাজসিদ্ধান্তের দৃঢ়তা। অপর্ণার আবির্ভাব আর তার বক্তব্য রাজাকে যে নবতর সত্য উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়, তাকে পরবর্তী একদৃশ্যে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে —

স্বর্গ

হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে।

(১/৪)

‘স্বর্গ হতে’ আচম্বিতে পাওয়া এই সত্য, এই মিস্টিক অনুভব তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস প্রভাবিত করল। এবং সেই সঙ্গে তা প্রজাদের ধর্মীয় অভ্যেস বা স্বাধীনতার দাবিকে অস্বীকার করে রাজার সিদ্ধান্ত হিসেবে তাদের উপর

আরোপিত হল। মন্দির বা ধর্ম রাজ অধিকারের আওতায় পড়ে কিনা এ প্রশ্ন রঘুপতি, নয়নরায়, গুণবতীর তর্কে বারবার এসেছে। গুণবতী স্পষ্টতই বলেন—
মন্দিরের

বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো। (১/৪)

গোবিন্দমণিক্যের সংলাপেও বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে ‘আমার ত্রিপুররাজ্যে’ বা ‘আমার আদেশ’ জাতীয় রাজমহিমা সচেতন অহং নির্দেশক বাক্যাংশ। এই দার্ঢ্য ‘রাজর্ষি’র রাজারও ছিল কিন্তু হয়তো নাটক নয় বলেই তার অভিঘাত ছিল কম। আর রাজর্ষিতে গোবিন্দমণিক্যের প্রধান সাধনাই রাজআবরণ মোচনের। গ্রামের অসুস্থ বালককে দেখে রাজ অস্তিত্বের অসারতা যেন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন —

‘আমি কেবল কয়েকটি বৎসর রাজত্বই করিয়াছি...কী করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না।’

রাজাকুলের কাছে মগেদের দুর্গে অজস্র বালক পরিবৃত হয়ে গোবিন্দমণিক্যের আচরণ ও দিনযাপন ছিল এমনই যেখানে লোকমুখে তাঁর পরিচয় — ‘একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন।’

গোবিন্দমণিক্য চরিত্র কল্পনায় একজন সমালোচক বুদ্ধদেবের চারিত্রিক ঐতিহ্যের স্বীকরণের উল্লেখ করেছেন।^৮ অহিংসার প্রচারক হিসেবে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে গোবিন্দমণিক্যের একটা সাদৃশ্য সূত্র টানা যেতে পারে কিন্তু বুদ্ধদেবের সর্বস্বত্যাগের ধারণাটি গোবিন্দমণিক্য, অন্তত বিসর্জন-এর গোবিন্দমণিক্য সম্পর্কে খাটে না। গোবিন্দমণিক্য রাজ্য ত্যাগ করেছেন ঘটনাচক্রে, ভাগ্যবিড়ম্বনায়। তিনি রাজসুলভ সামাজিক অভ্যেস ত্যাগ করেছেন কিছুটা বাধ্য হয়ে। উপন্যাসের গোবিন্দমণিক্যের রাজাকুল দুর্গবাসের পরিবেশে হয়তো ক্ষীণভাবে মনে পড়তে পারে বুদ্ধদেবের করুণার আদর্শের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল বুদ্ধদেবের বৃহত্তর আনন্দময় সত্তা। বুদ্ধের রাজত্ব ত্যাগের ঘটনাটিও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই সূত্র ধরে —

বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাষিতে পারে নাই।^৯

গোবিন্দমণিক্যের রাজ্যত্যাগের পিছনে এ রকম আনন্দের উৎসারণ নেই। সে রকম রাজার জন্য রবীন্দ্রনাটককে অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু বছর।

॥ ৬ ॥

রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা বা মালিনী ইত্যাদির পর সিরিয়াস নাটক রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধান। এই সময় (১৮৯৬-১৯০৮)

রবীন্দ্রনাথের প্রহসন রচনার কাল। ১৯০৮-এ প্রকাশিত হল শারদোৎসব, নলিনী (১৮৮৪)র দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর আবার পাওয়া গেল সিরিয়াস গদ্যনাটক। সেই সঙ্গে নবতর বিন্যাসের রবীন্দ্রনাটকেরও সূচনা, যে ধরনের নাটক বিশেষভাবেই রবীন্দ্রস্বাক্ষরিত। আঙ্গিক এবং ভাবনা উভয়তই নিজেকে পূর্ণতর করে প্রকাশ করবার জন্যেই কি এই দীর্ঘ প্রস্তুতির আয়োজন?

এ যাবৎ যে সব রাজাদের পেয়েছি আমরা তার মধ্যে বউঠাকুরানীর হাট-এর রাজা একজন নির্মম এবং প্রতাপশালী মানুষ। তবে নাট্যরূপান্তরের প্রতাপাদিত্যকে তখনো আমরা পাইনি। প্রায়শ্চিত্ত লেখা হয়েছে ১৯০৯ অর্থাৎ শারদোৎসব-এর পরের বছর। সেই জন্য আমাদের এই মুহূর্তের গণনার বাইরে। আর এক রাজা বিক্রমদেবের আবেগ তাঁকে রাজকর্তব্যের দায়িত্বপালন থেকে বিচ্যুত করেছে বা তাঁর চরিত্রে আদৌ দায়িত্বসচেতনতাই হয়তো নেই। এঁরা দুজনেই অর্থাৎ প্রতাপ ও বিক্রমদেব রাজচরিত্র মাত্র, দোষেগুণে মানুষ। রাজাকে কোনো বিশেষ আদর্শে তস্থায়িত করার চেষ্টা সেখানে নেই। তবে বিক্রমদেবের মধ্যে দিয়ে আদর্শ প্রজাপালক রাজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার একটা ছবি পাওয়া যায়। মালিনীর রাজাও দায়িত্ববান শাসক, কন্যাস্নেহের দ্বন্দ্বও তাঁর রাজকর্তব্য টলে না। মালিনীও অবিচলভাবে প্রজার দাবি মেনে নিজের নির্বাসনের স্বপক্ষে রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয় — ‘পিতা, তুমি নরপতি / রাজার কর্তব্য করো।’ রাজা গোবিন্দমাণিক্য অহিংসার বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার মুখপাত্র হতে পারেন কিন্তু তিনি রাজমহিমা সচেতন মানুষ। রাজার অহং-এর আবরণের মোচনের সাধনায় অন্তত নাটকের রাজা খুব সচেষ্ট নন, কিন্তু উপন্যাসে যে তার বীজ ছিল তা আগেই দেখেছি আমরা।

কাঙ্ক্ষিত রাজা বিষয়ে এতদিনকার অগোছালো এলোমেলো ভাবনাগুলি সাজিয়ে রাজার আদর্শ চরিত্রটি প্রথমবার পরিষ্কার ভাবে এবং হয়তো চূড়ান্ত ভাবেও দেখা গেল শারদোৎসব-এর বিজয়াদিত্যের মধ্যে। শরৎকালের ছুটির ডাকে রাজা বেরিয়েছিলেন রাজত্বের গুরুভার ছেড়ে খেলার অবসরে। শুধু কি রাজা? নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কাছে বিভিন্নভাবে এসে পৌঁছেছে শরতের ডাক। পুরাকালে রাজাদের মতো সোমপাল ভাবে দিগ্বিজয় আর রাজ্যবিস্তারের কথা, ছেলের দল-ঠাকুরদাদার চলে খেলার আয়োজন, এমনকি লক্ষেশ্বর অবধি বলে — ‘আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে।’ কিন্তু এ সব আয়োজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টানে উপনন্দ, নাট্যকারেরও ঝোঁক তারই দিকে। শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী নিজের নাটকের এই পথটুকুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রধান ধূয়োটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন — তা তাঁর দুঃখতত্ত্বের অশান্তির সুর, রুদ্ধতা পেরিয়ে রুদ্ধের প্রসন্ন মুখ দর্শনের কথা। উপনন্দ মানুষ হয়েছে

বীণকার সুরসেনের দুঃখের অঙ্গে। শত দুঃখের দলে যে ঈশ্বরের সোনার পদ্ম সংসারে ফোটে, সে খবর রাজা পান উপনন্দের কাছ থেকে। উপনন্দ রাজার ‘সত্যকার সাথি’—‘কেন না এ ছেলেটির সঙ্গে শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ — ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে — সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম’ (আত্মপরিচয়)।

শরৎপ্রকৃতি যে রকম ভাবকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিল, তার বিস্তৃততর অনুভবের কথা পাব জীবনস্মৃতিতে। তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল দুঃখের সাধনপন্থার কথাও। মৃত্যুশোক অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে সেই বিশেষ সময়ে শরৎ ঋতুই যেন মনের সিংহাসন অধিকার করে বসে ছিল। সেই বৈরাগ্যের মধ্যে প্রকৃতির রমণীয়তা ছিল, দিন যাপন চলত এক সৃষ্টিছাড়া চালে - - ‘এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আশ্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।’ পাঠশালা পালানো ছুটির এই প্রতিমাটি আমরা পাব বিজয়াদিত্যেরও সংলাপে। ‘শরৎ কালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের’ (কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি)। শরৎকালের এই যে চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিস্ফুট, তার প্রতিভাস বিজয়াদিত্যের চরিত্রের মানবমুখিনতাতেও।

রবীন্দ্রভাবনায় বৈরাগ্য কখনোই মানববিমুখ কোনো ব্যাপার নয়, বরং ঠিক তার উন্টো। মৃত্যুশোক অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার সমকালেই তিনি একথা বলবার মতো প্রসারতা লাভ করেছিলেন ‘অনুরাগ বন্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে ; অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে’^{১০}। ঠিক একরকম ভাবে পরিণত বয়সে বলছেন এ যেন ‘প্রজাপতির গুটি কেটে’ বেরোবার মতো ‘বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তিবন্ধন’ ছিন্ন করা হয় (বৈরাগ্য / শান্তিনিকেতন) এবং তার পরিণাম যে আনন্দে ‘সেই আনন্দই প্রেম’ ‘সেই আনন্দই অমৃত’। জীবনস্মৃতির কথকের অনুভবে যেমন শরৎপ্রকৃতির সূত্রে বাঁধা পড়েছিল দুঃখজাত আনন্দময় ফসল বৈরাগ্য, ছুটির সুর আর মানবমুখিনতা, তেমন এ সবকটি জলমাটির যোগেই গড়া হয়েছিল চার বছর আগের নাটক শারদোৎসব।

সম্রাট বিজয়াদিত্য এই নাটকে সম্রাসী বেশে রাজা সোমপালকে ‘অখণ্ড রাজ্যে অধীশ্বর’ হবার কৌশলটি শিখিয়ে দিচ্ছে এইভাবে :

গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ড রাজ্যটি ছেড়ে দাও।

বলা বাহুল্য, তাঁর কথার গুরুত্ব ধরতে পারে না সোমপাল, উড়িয়ে দেয় পরিহাস বলে।

শরৎকালের ছুটির পালায় সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজা হয়েও বৈরাগী, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর আনন্দময় খেলার আয়োজন। তিনি রাজধানী থেকে ছুটি নিয়েছিলেন

আচার্য সুরসেনের বীণার টানে। আচার্যকে পেলেন না, কিন্তু তাঁর শিষ্য উপনন্দের কল্প্যাণে সুরসেনের ‘আর এক বীণা’ শোনবার সৌভাগ্য হয় বিজয়াদিত্যের। উপনন্দ চরিত্রগুণে এ-সাধারণ একটি বালক। কিন্তু একেবারে সাধারণ গুণহীন বালকদলও রাজার সঙ্গী হতে পারে। তাদের অন্যতম যোগ্যতা বয়সের অনায়াস ভারহীন সহজতা। রাজ্যশাসনের অচলায়তন ফেলে বিজয়াদিত্যের শারদ অবকাশের সাধনার এক সহযোগী উপাদান হিসেবে কৈশোরের এই অমলতার ব্যবহার। ডাকঘর নাটকে অমল ও রাজার সম্পর্কের মধ্যেও আছে এই ভারহীন সহজতার আকর্ষণ।

‘রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই’—বিজয়াদিত্যের এই কথাই একবছর পর ঘুরিয়ে বলবে প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগী। বৈরাগীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রতাপ চরিত্রের যে মুক্তিসন্ধানী ‘ডাইমেনশন’ যোগ করা হয়েছে, যা নিয়ে আগে আলোচনা করেছি আমরা, তা একবছর আগের নাটকের রাজার আদর্শের রেশ কিনা তাও ভাবা যেতে পারে। এই জোয়ারের অবসানেই হয়তো আরও কুড়ি বছর পরে লেখা পরিত্রাণ (১৯২৯)-এ বিয়োজিত হয়েছে প্রতাপ চরিত্রের এই নবতর ভাঁজ।

শারদোৎসব-এর রাজার জীবনে এই অবকাশই কিন্তু শেষতম সত্য নয়। তাঁর জীবন শুধুই ‘বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি’ ‘ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো’ কেটে যাবে না। তিনি আবার ফিরে গেছেন রাজকাজে, সঙ্গে নিয়ে গেছেন তাঁর ছুটির প্রাপ্তি উপনন্দ আর ঠাকুরদাদাকে। ‘রাজ্যটাকৈ যে পথ বলে জানে, সেই যথার্থ পথিক - ধনঞ্জয় বৈরাগীর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাধ্য ছিল না প্রতাপাদিত্যের ; ঠিক সেই সাধনাই করতে চেয়েছেন রাজা বিজয়াদিত্য। কর্তব্যপালক দক্ষ রাজা হয়েও অন্তরে বন্ধনমুক্ত হবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের রাজাদের মধ্যে খুব নতুন নয়।

শারদোৎসব-এর বছর আষ্টেক আগে লেখা কথা-র সামান্য ক্ষতি বা রাজবিচার-এর প্রজাবৎসল রাজাদের দেখেছি আমরা ; কোশলরাজ অক্রেশে প্রজার আকাঙ্ক্ষাপূরণে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন (মন্তকবিক্রয় কবিতা)। আর আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়বে প্রতিনিধি কবিতার রাজগুরু রামদাসের কথা। নিজের শিষ্য শিবাজিকে যিনি রাজ্যচালনার সেই কঠোর সাধনার পথে এগিয়ে দেন, যেখানে — ‘রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন’। রাজা হবেন — ‘ভিক্ষুকের প্রতিনিধি / রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন’। বিজয়াদিত্য বা শিবাজির সঙ্গে সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকের যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈবভাবনার পক্ষপাত যেন কাজ করেছে। শিবাজির গুরু রামদাস তো স্পষ্টতই ছিলেন শিবভক্ত। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা চিঠিতে নিজের ‘মনের হাওয়া’ তৈরি করবার জন্য উপনিষৎ আর বৈষ্ণবতাকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন^{১১}, পাশাপাশি শৈবতাকেও তেমনি। নিজের কথা বলতে গিয়ে

হেমন্তবালা দেবীর কাছে লিখেছেন — ‘আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পলায়নি কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব — ভিখারী এবং সন্ন্যাসী’^{১২}। ফাঙ্কুনী, বসন্ত, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, কালের যাত্রা-র কবির দীক্ষা — শুধু নাটকের দিকে আলাগা চোখ বোলালেই দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়ে যায় — যার মূলে আছে ভিখারি, সন্ন্যাসী এবং পাগল — শিবচরিত্রের এই ত্রিমুখ।

এর আগের পরিচ্ছেদে বিসর্জন প্রসঙ্গে আলোচনায়, রবীন্দ্রব্যাখ্যায় বুদ্ধের রাজ্যত্যাগে আনন্দের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আনন্দে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পেরেছিলেন বিজয়াদিত্য। তাই শুধু ছুটিতে নয়, রাজ্যশাসনের ভারও তাঁর কাছে লঘু হয়ে গেছে ; সেখানেও আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি।

তেরো বছর পরে শারদোৎসব যখন পরিবর্তিত হল ঋণশোধ-এ তখন কবি চরিত্রটি হয়ে গেল রাজার চালক। সূচনা অংশটিতে কবির সঙ্গে রাজার কথাবার্তা আগে থেকেই জানতে পারি আমরা। তাই শারদোৎসব-এ সন্ন্যাসীর রাজরূপ উদ্ঘাটনে রোমাঞ্চের যে উপাদান ছিল তার চমক বাদ গেল। এহো বাহ্য। আসলে রাজার চারিত্রিক গুরুত্বই কমে গেল, কবিই হলেন প্রধান চালিকাশক্তি — সেই কবি যার বাক্সজ্জার প্রতিটি খাঁজে নাট্যকারের অভিপ্রায় ধরা পড়ে। এই কবি যার নাম শেখর, রাজাকে নবীন হওয়ার মন্ত্র শেখায়। ফাঙ্কুনীর ‘বসন্ত’ বা কবির দীক্ষার কবির মতো এরও মধ্যে আছে বৈরাগ্যের, বাউলের ধর্ম। আছে শিব মন্ত্রে দীক্ষাও। ‘কালিদাস ছিলেন শৈব / সেই পথের পথিক কবির’ কবির দীক্ষার কবির এই স্বীকারোক্তি ঋণশোধ বা অন্যান্য নাটকের কবিচরিত্রগুলির মুখেও বেমানান হত না।

শারদোৎসব ‘ঋণশোধ’-এ বালকদলের সঙ্গে রাজার যে খেলার আয়োজন ‘লিপিকা’র দুটি বালক বালিকা রুচিরা কৌশিকের সঙ্গে রাজা তেমন খেলাঘর সাজিয়েছিলেন। তার পর এদের যৌবনলীলারও পৌরোহিত্য করেছেন রাজা। কিন্তু লিপিকার ওই কথিকারই আর একজন রাজা কাঞ্চীর প্রতাপশালী রাজা। তিনি বালকদলের যুদ্ধখেলায় নিজের পরাজয়ের গল্প শুনে ধৈর্য হারান, কঠোর দণ্ড দেন তাদের। বাক্ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় বালকদের, তারা যেন খেলাতেও আর কোনোদিন না বলতে পারে — ‘কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার’ (বিদুষক)। দুজনেই রাজা, অথচ দুই প্রান্তসীমার মানুষ তারা। রাজার খেলার সূত্রে যদিও প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে লিপিকার এ সব লেখনগুলি তবু, নাটকের সঙ্গে এদের গোড়ায় একটা গরমিলের জায়গা আছে। লিপিকার প্রধান সূরটা রূপকথা ঘেষা, তার অন্যতম কারণ লিপিকার মধ্যে বিশ্বাসীরসিকের গুণগ্রাহিতার দাবি সবচেয়ে বেশি। রূপকথার মতোই অসম্ভব জগতের সুস্মরেখাটি এখানে বারে বারে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শারদোৎসব-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাটকে যে রাজাদের আমরা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে লেগেছে অপার্থিবতার ছোঁয়া। আর পাশাপাশি পার্থিব জগতের যে রাজাদের পাব, তাদের মধ্যে আদর্শ রাজার মিথ্ গড়ে তোলার তেমন কোনো চেষ্টা নেই। রাজারা সাধারণত চরিত্রমাত্র এবং অনেক সময়ে গৌণ চরিত্র। শেষবর্ষণ-এর রাজা পালাগানের শ্রোতা আর সে গান কখনো চকিতে খুলে দিয়েছে তাঁর মনের জানালা। নটরাজ স্বয়ং এ নাটকের আসল কর্ণধার। ফাল্গুনীর রাজার ভূমিকাও প্রায় সেই রকম। ঋণশোধ, ফাল্গুনী, শেষবর্ষণ-এ কবিদের দাপটই প্রধান — নাট্যকারের অভিপ্রায়ের প্রতীক চরিত্র তারাই। রথের রশির রাজাকে সামনাসামনি পাই না, তার উল্লেখটুকু পাই, তাঁর টানে রথের দড়ি নড়ে না। নিজের নিয়মের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ও বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন তাসের দেশ-এর রাজা। কিন্তু বিদেশী রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রের প্রাণের টানে তা আর টিকিয়ে রাখা গেল না। বিশেষত স্বয়ং রানিই যখন 'ইচ্ছের জয়' ঘোষণা করলেন। তাসের দেশ-এর রাজার পক্ষে কঠিন হয়নি 'চলো নিয়মমতে'র বুলি ভাঙা, রানি ছিলেন তাঁর সহায়। রানির এরকম সহায়তা পাননি গোবিন্দমাণিক্য। সে ক্ষোভও তাঁর ছিল। বলেছেন 'কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।' কিন্তু পাহাড়চূড়োর মতো একা নিঃসঙ্গ যক্ষপুরীর রাজা? রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে প্রতাপের প্রচণ্ডতার চূড়ান্ত এবং মর্যাস্তিকতম রূপ রক্তকরবীর রাজা। এ নাটকের চার বছর আগের মুক্তধারার আখ্যানকল্পনায় আছে বউঠাকুরানীর হাট-প্রায়শ্চিত্তের বিন্যাস। রাজশক্তির প্রচণ্ডতার সঙ্গে বিরোধ ও শেষে ভাঙনের জয়গান — প্রায়শ্চিত্তের এই কাহিনি কাঠামোর সঙ্গে মুক্তধারায় যোগ হয়েছে যন্ত্রশক্তির 'বস্ত্র বিশ্ববক্ষোদংস ধ্বংস বিকট' রূপটি। রক্তকরবীতে সংকটটি হয়েছে ব্যাপকতর — একটি যন্ত্রমাত্র নয় মুক্তধারার মতো, পুরো সমাজ ব্যবস্থাই সেখানে যন্ত্রকবলিত। ফলত প্রতাপের মাত্রাই শুধু বেড়ে যায়নি, এ প্রতাপের পরিণতিও এমন যে রাজার নিজের যন্ত্র তাকে মানছে না। পুরো শক্তিই তখন নাগালের বাইরে। অভিজিতের মৃত্যু দুঃখের হলেও ততটা দুর্ভাগ্যের নয়, তার একটা সদর্থক দিক আছে। কিন্তু রঞ্জনের মৃত্যু দুর্ভাগ্যের, পরিতাপের। রাজা নিজেই বোঝেননি কখন তাঁর যন্ত্রদাস তাঁরই প্রভু হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাটকে রাজাকে মঞ্চে দেখতে পাব না আমরা। যেমন রাজা - অরূপরতন-শাপমোচন, ডাকঘর, রক্তকরবী। এদের মধ্যে এক ডাকঘর ছাড়া প্রত্যেকটিতেই রাজার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। সবকটি নাটকেই আছে প্রতীকের ব্যবহার। কিন্তু রক্তকরবীর ব্যবহারটা একেবারেই ভিন্নমাত্রিক।

রক্তকরবীর প্রেক্ষাপট কঠিন জাগতিক বাস্তব নির্ভর। লেখকের দূরদর্শিতায় যে ভয়ানক ভবিষ্যতের ছবি ধরা পড়েছে, তা শিল্পিতভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক : কাহিনিবিন্যাস এবং সংলাপ, উভয়তই। অর্থাৎ প্রতীক এখানে নাট্যভাষার অঙ্গ, প্রকাশের মাধ্যম। আর রাজা, অরুপরতন, শাপমোচন বা ডাকঘর-এ প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে আধ্যাত্মিকতার সোপান হিসেবে। কারণ সেখানে নাট্যমাধ্যমের পাশাপাশি নাট্যবিষয়টিও অধরা।

রাজা পর্বের তিনটি নাটকের অন্যতম বক্তব্য রাজা-সুদর্শনা কাহিনি নির্ভর। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মহলে বহুবার বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুঃখতত্ত্বের কথা, উত্তরণের পথে আঘাত পেয়ে অভিমান ক্ষয়ের কথা। তবে গভীর কথা বাদ দিয়েও এই নাটক তিনটির একটা বহিরঙ্গ কাহিনিনির্ভর পাঠও অসম্ভব নয়। যেমন অদৃশ্য রাজাকে নিয়ে প্রজাদের নানারকম প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গটির পার্থিব মূল্যই বেশি।

রাজা সম্পর্কে প্রজাদের একটি পূর্বনির্ধারিত ধারণা আছে — যে রূপটা রাজার প্রতাপনির্ভর। সাধারণভাবে রাজা ‘নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে ছাড়ে না’ (কৌণ্ডিল্য রাজা)। ‘সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে’ বা অন্তত পক্ষে ‘চোখ পাকিয়ে বলে বেটার শির লেও’। এ সব নিদর্শন না দেখে গেলেও ‘এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম’ তা দক্ষ রাজার পরিচালনা ছাড়া সম্ভব বলে মনে করা কঠিন হয় প্রজাদের পক্ষে। বা ‘এত লোক মিলে যে আনন্দ’ তারও পিছনে রাজার অস্তিত্ব টের পায় জনার্দনের মতো কোনো প্রজা (অরুপরতন-এ মাধব)। এই উভয়সংকটের সমাধান জোগায় ঠাকুরদা।... ‘সে যে আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে’। এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে গীত হয় ‘আমরা সবাই রাজা’ গানটি সকলে রাজা হওয়াই যে প্রকৃত রাজার সঙ্গে মেলবার অন্যতম পথ, এ ভাবনার পিছনে ‘আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে’ — এ ধরনের আধ্যাত্মিক দর্শন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ‘দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্ব’র প্রতাপের অভ্যাস চূর্ণ করার দাবিটি নিতাস্তই জাগতিক।

॥ ৯ ॥

ডাকঘর, রাজা - অরুপরতন - শাপমোচন-এর অদৃশ্য সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ রাজা বলেন — এ যেন গীতাঞ্জলির কবির ঈশ্বরকে ভালোবেসে রাজা বলা : প্রণয় সম্বোধন। অনেক সময় এ জাতীয় রাজসম্বোধন এক ধরনের দ্বিস্তর রচনা করেছে। প্রায়শ্চিত্ত-এ ধনঞ্জয় বৈরাগী মাধবপুরের প্রজাদের বলে —

তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরো একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন - শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজাদের তাড়াতে

কিছুই ক্ষতি হয় না।

(গান) আমরা বসব তোমার সনে

তোমার শরিক হব রাজার রাজা ।

তোমার আধেক সিংহাসনে।

বলাই বাহুল্য এই উৎকলনটির সংলাপ অংশে যে রাজার উল্লেখ আছে আর গানে উল্লেখিত রাজা ভিনজগতের বাসিন্দা। প্রতাপশালী রাজার চেয়ে বড়ো এক রাজার সন্ধান পাওয়া গেল গানে, যার খেলাঘরে রাজ্য শুদ্ধ ‘সবাই রাজা’।

শিবাজি গুরু রামদাসের জবানিতেও পাব এই রকম দুই রাজার কথা, পার্থিব আর অপার্থিব —

আমারে রাজার সাজে বসায়ৈ সংসার মাঝে

কে তুমি আড়ালে কর বাস!

হে রাজা রেখেছি আমি তোমার পাদুকা খানি

আমি থাকি পাদপীঠতলে —

সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই!

তব রাজ্যে তুমি এসো চলে। (কথা)

শুধু সম্বোধনজনিত স্বরক্ষিপণের মধ্যে দ্বিস্তর রচিত তাই নয়, কখনো চরিত্রকল্পনায় দেখি এর ভিন্ন ধরনের বিন্যাস। চোখে যে রাজাকে দেখছি, যার জাঁকজমক চোখ ধাঁধায় তাকেই সাধারণত মনে হয় রাজা। রাজায় সুবর্ণকে রাজা বলে ভুল করে সাধারণ মানুষ, এমনকি রানি স্বয়ং-ও। আসল রাজা থাকেন অন্তরালে, ‘দুঃখের অনলজ্বলন’ পার করে তবেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। শারদোৎসব - ঋণশোধ-ও ছোটো রাজা সোমপালের রাজব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন করে সন্ন্যাসীবেশী বিজয়াদিত্যের স্বরূপে প্রকাশ, স্বমহিমায়-ও।

ডাকঘর-এর রাজারও অনেকগুলি স্তর, অনেকগুলি মাত্রা। অনেকগুলি কথোপকথনে গড়ে-ওঠা এই রাজা চরিত্র অমলের কাছে রূপকথার রাজা, কিন্তু ঠাকুরদার কাছে তার অধ্যাত্ম মাত্রাও রয়েছে। আবার মোড়লের কাছে তিনি বাস্তব রাজা মাত্র, যিনি ডাকঘর স্থাপন করেন। রাজার সঙ্গে অমলের সখ্যের কল্পনার মধ্যে মোড়ল মাধব দস্তের ঔদ্ধত্যের গন্ধ পান। অমলকে নিয়ে মোড়লের পরিহাস আসলে মাধব দস্তকে নিয়েই পরিহাস। এই মোড়লেরই একটি অসতর্ক ছেলে-ভুলোনো উক্তিতে আমরা হঠাৎ যেন দেখতে পাই শারদোৎসব-এর বিজয়াদিত্যের উদ্ভাস — রাজ্যসুখে ক্লান্ত রাজা সাধারণ জীবনে খুঁজে নিতে চান আনন্দের চাবিকাঠি। মোড়ল সাদা কাগজে রাজার যে খবর আছে বলে জানায়, তা এই রকম :

রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো — রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না।

আমাদের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল রবীন্দ্রনাটকের রাজাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। বারবার ব্যবহৃত হয়েও কবি বা ঠাকুরদার মতো টাইপ চরিত্র নয়, রাজাদের নানা মুখ, এ-ও বলা হয়েছিল। মাটির পৃথিবীর রাজাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত রাজরূপ শারদোৎসব-এর বিজয়াদিত্যের মধ্যে শিখর স্পর্শ করেছে। রাজত্ব আর বৈরাগ্যের এই মিলমিশের আভাস আগের কোনো রচনায় থাকলেও নাটকের ক্ষেত্রে শারদোৎসব-এই তার পূর্ণতর প্রকাশ। রূপান্তরিত নাটক ঋণশোধ-এ সে গৌরব হাস পেয়েছে অনেকখানি। কিন্তু বিজয়াদিত্যের চরিত্রে বাস্তবতার চেয়ে সাধনালব্ধ আদর্শের অনুপাত বেশি। এ রকম তত্ত্বায়িত রাজা চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আর ফিরিয়ে আনেননি। হয়তো নাটকে প্রয়োজনীয় ‘অবজেকটিভিটি’র শর্ত তাঁর মাথায় ছিল, অভিপ্রায় দিয়ে চালিত করতে চাননি বাস্তবতাকে। রবীন্দ্র-অভিপ্রায় বাহিত রাজাদের অর্থাৎ শারদোৎসব - ঋণশোধ, লিপিকার পুনরাবৃত্তি বা প্রতিনিধি কবিতার শিবাজি — কালক্রমের বিচারে এঁদের আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় পর্বের রাজা। প্রথম পর্বের রাজারা ছিলেন ‘ভালো মন্দ মিশায়ে সকলি’ — মানুষ। যেমন প্রতাপাদিত্য বা বিক্রমদেব। গোবিন্দমানিক্যকে প্রথম আর দ্বিতীয় ভাবনাসন্ধির রাজা বলতে পারি। আর তৃতীয় পর্বে পাব এমন রাজাদের যাদের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি যন্ত্রশক্তি ধনতান্ত্রিকতার ক্রমশ বেড়ে ওঠা দাপটে রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে। মুক্তধারায় কম, রক্তকরবীতে তার প্রতাপ সবচেয়ে বেশি — রাজা নিজেই সেই জ্বালে আটক হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে যেমন, তেমনই তাঁর প্রবন্ধমালা লক্ষ করলেও বোঝা যায় যে রাজা সম্পর্কে তাঁর ভাবনার অন্যতম কেন্দ্র দুটি ; প্রথমত রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজার অভিপ্রেত সম্পর্ক, দ্বিতীয়ত রাজ-আকাঙ্ক্ষা বা প্রতাপের বাড়াবাড়ির অস্বস্তিজনক দিকটি। রাজাকে কোনো একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নয়, স্বদেশ বা সমাজের প্রতিমাস্বরূপ ‘একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে’ দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আগে ভারতবর্ষে রাজার অবস্থান সমাজে শীর্ষস্থানে ছিল, পাশ্চাত্যশাসনের ফলে তা আহত হয়েছে — এরকম ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন স্বদেশী সমাজ বা সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে।

বাস্তব পৃথিবীতে ক্ষমতার দত্তের অনিবার্য পরিণতিও রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। বিলেতে ইম্পিরিয়ালিজমের নেশা লক্ষ করে তাঁর মনে পড়েছে দেশজ পুরাণের রাজা বিশ্বামিত্র বা দশাননের স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী এক নিজস্ব জগৎ তৈরির উচ্চাশার কথা।^{১৩} পরবর্তী কালে শঙ্কিত হয়েছেন ন্যাশনালিজম বা ফ্যাসিজিম বা নাৎসিজমের দাপট দেখে। সভ্যতার ইতিহাসে অর্থলাভের উপায়ে যখন থেকে কাজে লাগানো গেল যন্ত্রশক্তিকে তখন থেকেই ‘বৈশ্যযুগের সূচনা লক্ষ

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ'। আর প্রতাপের দাপটের যুগে শক্তির সঙ্গে মিলেছে যন্ত্রের হাত, ফল হয়েছে বহুগুণিত।

‘বৈশ্যযুগের সূচনা’য় রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে রাজাদের পাই, আগেই বলেছি, তারা রবীন্দ্রনাটকের তৃতীয় পর্যায়। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ইতিহাসের বিচিত্র সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে এক নতুন রাজার সংজ্ঞা — যিনি আগের মতো সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নন, যিনি সর্বময় একটি ব্যবস্থার অঙ্গ। ফলত রবীন্দ্রনাথের নাটকেও রাজাকে পাওয়া যাবে এক নতুনতর আর্থসামাজিক কাঠামোয়। কিন্তু রাজা চরিত্র পুনরাবৃত্ত না হলেও রাজা ও সন্ন্যাসীর যে যুগলসম্মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সারা জীবন ধরে, সেই ভাবনা তাঁর অপরিবর্তিত থেকে গেছে। আর সেই জন্যই হয়তো, শেষ জীবনে মানুষের ধর্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় বঙ্গুতার শেষে রবীন্দ্রনাথ আবার স্মরণ করেন তাঁর যৌবনের কবিতার অংশবিশেষ :

...শুনিয়াছি তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কস্থা, বিষয়ে বিরাগী

পথের ভিক্ষুক।

বোঝা যায় যে রাজার অবয়বগত রূপান্তরকে স্বীকার করে নিলেও মূলগত কোনো ভূমিকার বদলের কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি।

উল্লেখপঞ্জি

(রবীন্দ্র নাটকের উদ্ধৃতিসমূহের সূত্রনির্দেশ বাহুল্যবোধে দেওয়া হল না। রচনাবলী বলতে বিশ্বভারতী সংস্করণ বোঝানো হয়েছে।)

১. রানী চন্দ, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ পৃ. ১২৬-১২৭
২. অশ্রুকুমার সিকদার, রবীন্দ্রনাটো রূপান্তর ও ঐক্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ২০০
৩. দ্র. ক. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাকুরদা ও কবি, রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ.
খ. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আঁধার রাতে একলা পাগল, পরিচয়, আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
গ. শিশিরকুমার দাশ, কবি ও সন্ন্যাসী - রবীন্দ্রজীবনীর খসড়া, বিভাব, বর্ষা, ১৩৯৩
৪. ছেলেবেলা, রচনাবলী ২৬, পৃ. ৬১০



৫. Hirankumar Sanyal, *The Plays of Rabindranath Tagore, A Centenary Volume*, Rabindranath Tagore, Sahitya Akademi 1961, p.235
৬. দ্র. সোমেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজিডী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৯৭
৭. সূচনা : রাজর্ষি, রচনাবলী ২, পৃ. ৩৭৩
৮. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৫, পৃ. ৯৫
৯. সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, রচনাবলী ৮, পৃ. ৩৯৫
১০. গ্রন্থপরিচয়, রুক্মিণী, বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী ৫, পৃ. ৫৬২
১১. দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪ কার্তিক, ১৩২৮
১২. চিঠিপত্র ৯, পত্র সংখ্যা ১৪, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ. ৩৩
১৩. ইম্পিরিয়ালিজম, রাজা ও প্রজা, রচনাবলী ১০, পৃ. ৪৩১

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : কয়েকটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা

অরুণকুমার বসু

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। সে সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পরবর্তীকালে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নতুন দু-একটি গবেষণাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কোনো জনপ্রিয় উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ-ত্রিপুরারাজের পরিচয়-সংক্রান্ত তথ্যাদিও উপন্যাসিক কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে কৌতূহলী পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে। অনেকটা তারই অনুপ্রেরণায় অরুণোদয় সাহা আর একটি রচনাশৈলী বেছে নিয়ে ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড়-ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ইতিহাসের কয়েকটি কক্ষকে আলোকিত করেছেন। অরুণোদয় সাহা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁর কর্মক্ষেত্র, অধ্যাপনা, গবেষণা, এই উপমহাদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসারিত। অথচ তাঁর বাংলা লেখার হাতটি অত্যন্ত পরিণত, ইতিপূর্বে ‘চলার পথে’ নামে তাঁর একটি ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতার পথচলতি সাহিত্য-বিবরণ পাঠকমহলে বিপুল সমাদর পেয়েছিল। ‘রাজা ও কবি’ অধ্যাপক সাহার একটি গল্পগ্রন্থ, যার অন্তর্গত ছটি গল্পের চরিত্রলিপিতেই আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, কর্ণেল মহিম ঠাকুর, ত্রিপুরার রাজমহিষী ও অনুরূপ কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র। প্রতি গল্পের নেপথ্যেই রয়েছে ইতিহাসের তথ্য, নানা সূত্র থেকে অনুপূঙ্খ বিবরণ জোগাড় করে, যতদূর সম্ভব ঘটনার নির্ভুল নেপথ্য সম্পর্কে বিশ্বস্ত হয়ে, তবেই অধ্যাপক সাহা তাকে গল্পরূপ দিয়েছেন। গল্প তো নয়—যেন চলচ্চিত্র-দেখা, আর পাঠ্য রচনাটি যেন তার সিনারিও। আগরতলার জনপ্রিয় দৈনিকের সাহিত্যপৃষ্ঠায় প্রকাশকালে এগুলি পাঠকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিল। রবীন্দ্রচর্চায় অভিনব এই সংযোজনটিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

রাজা ও কবি — অরুণোদয় সাহা ; ভাষা প্রকাশন — আগরতলা, ত্রিপুরা।
দাম ৬০ টাকা।

রবীন্দ্রচর্চায় রবীন্দ্রপরিকর, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ও কর্মী, রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারক-শিক্ষক, শিল্পী, রবীন্দ্রনাটকের অভিনেতা প্রযোজক প্রভৃতি নানা প্রতিভার সমাবেশ। এই তালিকায় শান্তিদেব ঘোষ প্রথম সারিতেই উচ্চাৰ্য নাম। দীর্ঘ শতাব্দী-ছোঁওয়া জীবনটিকে একদা তিনি রবীন্দ্রনাথের চরণে নিবেদন করেছিলেন। সেই ১৯১০ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময় ধরে তিনি তাঁর

সেই রবীন্দ্র আশীর্বাদ-ধন্য জীবনটিকে তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সেবায় ও রবীন্দ্রচর্চায় কাটিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথেরই উদ্যোগে ও প্রেরণায় যৌবনে শুরু হয়েছিল তাঁর নৃত্যশিক্ষা। তাঁরই চেষ্টায় ও শিক্ষণে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনৃত্যচর্চার একটি পদ্ধতি গড়ে উঠতে পেরেছিল। এই সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকেও তাঁর শেষ পারানির কড়ি করে নিতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর জীবনের এই শেষ অর্ধ-শতাব্দী তিনি রবীন্দ্রসংগীতকেই রবীন্দ্রচর্চার মুখ্য উপাদান ও উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলেন। সেই শান্তিদেব ঘোষের কর্মবরিষ্ঠ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশ্ববাণী পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ ২৪শে বৈশাখ শীর্ষক একটি মূল্যবান পুস্তিকা সংকলন করেছেন। ২৪শে বৈশাখ ১৪০৭ শান্তিদেবের জন্মদিন উপলক্ষে এটি প্রকাশিত হয় কিন্তু ততদিনে শান্তিদেবের জীবনদীপ নিভে গেছে। এই সংকলনে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বর মিত্র, সাগরময় ঘোষ, সুরজিৎ সিংহ, সুশীল সাহা, অমিতাভ ঘোষ, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রভৃতি নানা জনের স্মৃতিচারণ মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধার্পণ একত্র হয়ে শান্তিদেব ঘোষের জীবন ও সাধনার বৃত্তি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রদক্ষিণ করেছে।

২৪শে বৈশাখ – সম্পাদনা অমিতাভ ঘোষ ও শ্যামল দাশ, প্রকাশক অরুণরত্ন প্রকাশনী, কলকাতা, দাম পঁচিশ টাকা।

সুচিত্রা সাহা রবীন্দ্রচর্চাভবনের পাঠক্রমে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে আরও গভীরভাবে জানার ও সন্ধানের ইচ্ছায়। সেই অবেশা থেকে তিনি একটি অনতিদীর্ঘ কিন্তু পরিশ্রমসেবিত কাজ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে খেলাধুলার সঙ্গে কবির সংযোগ-সান্নিধ্য-সংশ্লেষ কতটা ঘটেছিল, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করেছেন এবং একটি গ্রন্থে তার পরিচিতি সূত্রন্যস্ত করেছেন। তিনি প্রথমে শিশু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণালোকটিকে কবির পরিণত বয়সের রচনা থেকে সংকলন করেছেন। তারপর জীবনীকারের নিষ্ঠায় কবির শিশুকাল, স্বভাব, বাড়ির পরিবেশ, ভৃত্যরাজক তত্ত্ব প্রসঙ্গ, গৃহবন্দীর কবির সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির পরিচয় লাভ, গৃহপরিবেশের কয়েকটি স্থানের সমীক্ষা, যেগুলি সম্পর্কে বালক-কবির বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল, সেগুলির তথ্যাদি চয়ন করেছেন। সেইসূত্রে এসেছে সেকালের ঠাকুরবাড়ির সেই পুকুর, পুকুরের পাশের শাখা জটিল গাছটি, বাগানের কোণের পোড়ো জায়গা, দেউড়ির কোণের ভাঙা পালকিটি, রাজার বাড়ির কল্পনা, কাঠের সিঁঙ্গি, গল্প-শোনার বাসনা, রেলিং নিয়ে মাস্টারির অভিনয়, ছন্দ মিলিয়ে কবিতা-লেখা, আরও কিছু ক্রীড়াকৌতুক, বাড়ির বাইরে-যাওয়ার অভিজ্ঞতা—হরেক বিষয়। এসেছে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মানুষজনের কথা, সঙ্গীসার্থী গুরুজনদের কথা। কিন্তু এসবই তিনি শিশু

ও বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার ভঙ্গিতে, শিশুপাঠ্য রচনার আকারে গাঁথেন নি। এই বাল্যলীলাটি পুনর্গঠন করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথেরই সারা জীবনের বহুতর রচনার অংশ থেকে। ঠিক-ঠিক প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকণা উদ্ধার করে, মাঝে মাঝেই তাঁর বিচক্ষণ মন্তব্য পাঠকের নজরে আসে। বাল্যস্মৃতি চর্চায় রবীন্দ্রনাথ বারেই নিষেধের অনুশাসনের কথা বলেছেন, খাঁচায় পোরা পাখির সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিতে এই জাতীয় কোনো গুরুজনের তাড়না বা কারাবদ্ধতার আক্ষেপ তো নেই! সুমিত্রা তার ব্যাখ্যানে বলেছেন, “মনে হয় বাড়ি বিভক্ত হওয়া, পিতার বাড়িতে না থাকা, এসব কারণে ছোটদের ওপর নানা ধরনের বাধা-নিষেধের বিধি আরোপিত হয়েছিল (পৃ. ৪১)।” এ অনুমান সংগত মনে হয়। এমনকী শিশু বয়সে মেঘাবৃত আকাশ দেখে বালক রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কতভাবে উদ্দীপিত হত, পরিণত বয়সের বহু রচনা থেকে তাও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। প্রসঙ্গসূত্রে বহুচারিতা তাঁর লেখার আরেকটি গুণ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় ফুটবল কলকাতায় সবে চালু হয়েছে বলে কবি জানিয়েছিলেন। সুমিত্রা সেই সূত্রে সিমলার দত্ত পরিবারের নরেন্দ্রনাথ ফুটবল ক্রিকেটে কতটা দক্ষ ছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ভাইয়েরা সেকালে ফুটবল-ক্রিকেটে কী পরিমাণে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেইসব খবর সংগ্রহ করেও আমাদের জানার সীমানাটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেন, আলোচনার বিষয়টিকে তথ্যবিস্তারে আকর্ষক করে তোলেন। উত্তরজীবনে শান্তিনিকেতনে কী জাতীয় খেলাধুলার আবহ তৈরি হয়েছিল, কোন প্রকারের indoor game কবি পছন্দ করতেন, হরেক প্রসঙ্গে এই বইয়ের পাতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রচর্চায় সুমিত্রার অধিকার, রীতিমত প্রশংসনীয় স্বীকার করতেই হয়। বিশেষ করে বালক বয়সের লেখালেখির পরিচিতি-সূত্রে সুমিত্রা মালতি পুথির অন্তর্গত রচনারও খোঁজখবর দিয়ে তাঁর এই আলোচনাটিকে অত্যন্ত মূল্যবান করে তুলেছেন। একেই তিনি বলেছেন খেলা থেকে খেলা-ভোলার জগতে উত্তরণ।

রবীন্দ্রচর্চার সাম্প্রতিক তালিকায় সুমিত্রা সাহার ‘রবিজীবনে খেলা ও খেলাভোলার দিন’ বইটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

রবিজীবনে খেলা ও খেলা ভোলার দিন – সুমিত্রা সাহা – ত্রিশ টাকা



পাঠকের চিঠি

307, Bhalubassa
Jamshedpur
831009

মাননীয় সম্পাদক, 'রবীন্দ্রভাবনা'

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্রভাবনার গতবর্ষের চতুর্থ সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যটি সম্পর্কে বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় [জানু-মার্চ '০১] বিশ্বভারতীর 'অধিকর্তা : সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও অধ্যক্ষ : রবীন্দ্রভবন' [অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ] অধ্যাপক স্বপন মজুমদারের যে চিঠিটি পত্রস্থ হয়েছে ও আপনি তার যে 'সাধ্যমতো' উত্তর দিয়েছেন, সে-গুলি পড়ে কয়েকটি কথা মনে হলো। বিশেষ করে অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ মহোদয়ের বক্তব্যের যে-সব অংশ নিয়ে আপনি আলোচনা করেন নি, তেমন কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোকপাত প্রয়োজন মনে হওয়াতেই এই চিঠি।

১। বিশ্বভারতীর অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ মহোদয় জানিয়েছেন যে, সেখানকার রবীন্দ্রভবনের রবীন্দ্রবিষয়ক একটি আড়াই বছরের পুরানো ওয়েবসাইট আছে এবং বিশ্বভারতী আত্মপ্রচার করেনি বলেই এটির কথা বিশ্বভারতীর শিক্ষণরত অধ্যাপকেরাও জানতে পারেন নি! যে কোনো বিষয়ের বই বা ওয়েবসাইট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী গবেষকজনের ব্যবহারের জন্য, সেটি সম্পর্কে প্রচার তার প্রকাশক / নির্মাতাদের কর্তব্য বলেই গণ্য হয়ে থাকে। রবীন্দ্রবিষয়ক ওয়েবসাইট নিয়ে প্রচার করলে সেটা বিশ্বভারতীর 'আত্মপ্রচার' হতো না — যেটা রবীন্দ্রচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারই হতো এবং তাঁরা যে সে-প্রচার করেননি, এটা কোনো শ্রাঘ্য বিষয় নয়, কর্তব্যচ্যুতি বা শৈথিল্য মাত্র।

এ-প্রসঙ্গে জানানো যায় যে, নিজেদের প্রকাশনা সম্পর্কে নিয়মিত প্রচার বিজ্ঞাপন ও গ্রন্থতালিকার মাধ্যমে বিশ্বভারতী নিয়মিত করেই থাকেন। তাতে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংবাদের ঘাটতি বা অনুল্লেখও থাকে [যেমন রবীন্দ্র রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে কী আছে, তার কোনো সংক্ষিপ্ত উল্লেখও বিশ্বভারতীর বইয়ের ক্যাটালগে পাওয়া যায় না] — এগুলির কারণ নিশ্চয় 'আত্মপ্রচারে' কোনো কুষ্ঠা নয়, পাঠকজনের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও

ঔদাসীনা। বাৎসরিক এইসব বিজ্ঞাপন ছাড়াও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে এই সংস্থার কর্তব্যাক্তিরা সাংবাদিকদেরও সময়ে সময়ে তথ্যাদি জানাতে কিন্তু কার্পণ্য করেন নি। যেমন ধরা যাক, ১৯৯৪ সালে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক জানিয়েছিলেন, ২৭টি খণ্ডের পরও অগ্রস্থিত রচনা নিয়ে রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তত আরও ৫টি খণ্ড, চিঠিপত্রের সব মিলিয়ে ২০ খণ্ড পর্যন্ত, ৫টি ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলী ও ইংরিজিতে নির্বাচিত রবীন্দ্ররচনা ইত্যাদি প্রকাশের পরিকল্পনার কথা। এ-গুলি যদি ‘আত্মপ্রচার’ না হয়ে থাকে, তবে বর্ধিত গ্রন্থস্বত্বের দশ বছরেও অতিরিক্ত রবীন্দ্ররচনাবলীর চারটি খণ্ড, চিঠিপত্র ১৮শ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেও কেন আরও রচনা ও পত্রাবলী এখনও অগ্রস্থিত থেকে গেল, অন্যান্য ভাষায় রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের সেই প্রতিজ্ঞাই বা কতটা পরিপূরিত হলো — এসব সম্পর্কে পাঠককে না জানানোটাকে কি ‘প্রচারবিমুখতা’ বলা উচিত—না দায়িত্ববোধের অভাব?

২। বিশ্বভারতীর অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ মহোদয় “১৯৯১-তে গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ বাড়ানোর আন্দোলন”—এরকম একটি যে-বাক্যবদ্ধ ব্যবহার করেছেন, সেটি শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, উদ্ভটও বটে। ১৯৯১ সালে একটি সংস্থার মুন্যাক্ষে সংরক্ষিত রাখার জন্য গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ বাড়ানোর সপক্ষে যে নজীরহীন কাণ্ডটি হয়েছিল তাকে ‘আন্দোলন’ কোনো মতেই বলা চলে না। ‘ষড়যন্ত্র’ বললে যদি একটু নাটকীয় শোণায় [ইদানীং কুখ্যাতির ধার কমে গেছে বহু ব্যবহারে]—‘বন্দোবস্ত’ বলা যেতে পারে অবশ্যই। তদানীন্তন রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করে কেন্দ্রের সংখ্যালঘু সরকার পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও পাঠকের মতামতকে উপেক্ষা করে গ্রন্থস্বত্বের যে মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল, তা সকলেরই জানা আছে। এর সপক্ষে কোন আন্দোলন হয়নি। কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য রাজ্য সরকারের শরিক দলগুলির সাংসদেরা ও তল্লিবাহক দুঃএকজন বুদ্ধিজীবী অবশ্যই বিশ্বভারতীর আবদারের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। একজন সাংসদ গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ পঞ্চাশ থেকে বাড়িয়ে একশো বছর করার দাবী করেছিলেন আর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং আরও কুড়ি বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন।

মেয়াদবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবশ্য একটি আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল, কারণ অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবীই এই মেয়াদ বৃদ্ধি চান নি। সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, ডঃ ত্রিগুণা সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃতির নানা অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা এই মেয়াদ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের অনেকে এর বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের মানব সম্পদবিকাশ মন্ত্রকে

ডেপুটেশন পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু এর বেশি কিছু দানা বাঁধেনি, যাকে আন্দোলন বলা চলে। “চাই সমগ্র, শুদ্ধ ও সুলভ রবীন্দ্রনাথ” শিরোনাম একজন গবেষক অবশ্য ‘গণশক্তির’ পাতায় পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁরা বিশ্বভারতীর গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদবৃদ্ধির দাবী সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু এই পাঁচবছরে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রগ্রন্থগুলির ‘অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির’ ফলে গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রগ্রন্থসমূহের মূল্য ক্রমশ “সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে” এবং —“সমগ্র রচনাবলী আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবো না।” [সদ্যপ্রয়াত নেপাল মজুমদারের লেখা, ৮-৫-৯৬]

৩। অন্য এক জায়গায় বিশ্বভারতীর অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ মহোদয় জানিয়েছেন যে, গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদবৃদ্ধি সম্পর্কে রাজনীতির নেতারা নাকি মত পালটেছেন। আমাদের প্রশ্ন, দশবছর আগে মেয়াদবৃদ্ধি প্রয়োজন বলে যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কথা বলেননি যে, অনন্তকাল ধরে গ্রন্থস্বত্ব যাতে বিশ্বভারতীই ভোগ করতে পারে, তাই মেয়াদবৃদ্ধি চলতেই থাকবে! আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, মেয়াদ বাড়ানোর দরকার নেই, তবে সেটাকে মত পালটানো বলা চলে কি? রাজনীতির নেতারা অবশ্য মত পালটিয়ে ডিগবাজি খান না, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু বলতে চাই যে, রাজনীতির এই খেলা আজই শুরু হয়নি। মত পালটানোর খেলা শুরু হয়েছিল যে দশ বছর আগেই, তার সপক্ষে পুরানো সংবাদপত্র থেকে কয়েকটি খবর তুলে দিই। তার আগে অবশ্য একথাও জানিয়ে রাখি যে, এ-ব্যাপারে তাঁদের মত বদলের খবরে আমরা স্বস্তিবোধ করছি।

১৯৯১ সালে কেন্দ্র সরকার কপিরাইট আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ষাট বছর করে দেন ও এই মর্মে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন। তার কিছুদিন পরেই ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মাদ্রাজে মস্তব্য করেন, এই মেয়াদবৃদ্ধির ফলে রবীন্দ্ররচনা জনপ্রিয় হতে দেবী হবে। এতে বিস্ময় প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ‘মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী’ অর্জুন সিং মস্তব্য করেছিলেন, শ্রী বসু দু’সপ্তাহ আগে একথা জানালে তাঁরা অর্ডিন্যান্সই জারী করতেন না, কুড়ি বছর মেয়াদবৃদ্ধির সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন বলেই তাঁরা গ্রন্থস্বত্ব আইন সংশোধন করেছিলেন।

৪। যাঁরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন, তাঁদের অমনিতেই একটি দক্ষিণা দিতে হয়। নানা বিষয়ক পর্দা খুলবার জন্য আলাদাভাবে ঐ পর্দাটির নির্মাতাদের অর্থাগমের যে কথা সম্পাদক মহোদয় লিখেছেন, তা ঠিক বোধগম্য হলো না। আর রবীন্দ্রভাবনার সম্পাদক মহোদয় রবীন্দ্রভবনের অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অধ্যক্ষ মহোদয়কে ‘অর্থপ্রাপ্তির’ পথ দেখাচ্ছেন, এতেও একটু ধন্য

পড়েছি। কারণ এ-যাবৎকাল কপিরাইটের কল্যাণে যাঁরা জননন্দিত গায়ক ও নাট্য পরিচালককে নাস্তানাবুদ করেছেন, উপন্যাসের পাঠ, গানের স্বরলিপি পছন্দমতো বদলে দিয়েও রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে প্রচুর মুনাফা করেছেন, বিত্তশালী চলচ্চিত্র প্রযোজক থেকে দরিদ্র পত্রিকা প্রকাশক রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বা হস্তলিপি ব্যবহার করেও পার পাননি, এমন কি ভিন্দেদী প্রকাশকও রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী ছেপে কলকাতা বইমেলায় বিক্রির মজা টের পেয়ে গেছেন যাঁদের তৎপরতায়, তাঁরা কি আপনার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন সম্পাদক মহোদয়?

৫। এ-ছাড়াও কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, যেমন—‘রবীন্দ্র হস্তাক্ষর মুদ্রণের জন্য শতমুদ্রা দক্ষিণা দেওয়ার’ ব্যাপারটি বা সম্পাদক মণ্ডলীর একজনের ১৯৯১-তে গ্রন্থস্বত্ত্বের মেয়াদ বৃদ্ধির আন্দোলনে সামিল হওয়া! নানা প্রশ্ন জাগছে। রবীন্দ্র-হস্তলিপি প্রচ্ছদে ব্যবহারের অনুমতি যদি চাওয়া হয়, তাহলেই কি শতমুদ্রা দক্ষিণা দিতে হয়? অনুমতি ব্যতিরেকে নানা পত্রিকায় যদি তা ছাপা হয়, বিশ্বভারতী তখন কি করেন? ১৯৯১-তে গ্রন্থস্বত্ত্বের মেয়াদবৃদ্ধি কে কে চেয়েছিলেন? যতদূর জানি, রবীন্দ্রভাবনার সম্পাদক মণ্ডলীর বর্তমান সদস্যদের একজনই তখনকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। কিন্তু তিনি মেয়াদবৃদ্ধির সপক্ষে পত্রিকায় কিছু লিখেছিলেন বলে জানি না। আশা করি অঃ সঃ সাঃ সঃ ও অঃ রঃ মহোদয় অন্ধকার দূর করবেন।

অলমিতি

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

জামশেদপুর - ৯

২৫শে বৈশাখ, ১৪০৮

[বিশ্বভারতীকে রোজগারের ব্যাপারটি বলতে হয় না ঠিকই। কিন্তু তাঁদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে না দেওয়ার জন্যই কথাটি মনে করাতে হয়েছে।

রবীন্দ্রহস্তলিপি মুদ্রণের জন্য আমাদের শতমুদ্রা দক্ষিণা দিতে হয়েছিল। অন্যদের কথা জানি না। ১৯৯১-তে গ্রন্থস্বত্ত্ব মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ে ওঁরা আমাদের সম্পাদক মণ্ডলীকে যে কটাক্ষ করেছেন সে সম্বন্ধে আমরাও আমাদের চিঠিতে জানতে চেয়েছি।— স. র. ভা.।]

14 মে 2001 / রাজপুর

‘রবীন্দ্র ভাবনা’ সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

ভাষা যতটা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার থেকেও নাকি মনের ভাব লুকোতে সাহায্য করে বেশি। হাত জোড় করে অত্যন্ত নম্রভাবে শুদ্ধভাষায় অশিষ্ট শব্দ বললেও সেই অশালীন শব্দের তেজ কিছু কমে না। আমেরিকার NASA-র অতি ভদ্র বিনয়ী এক বিজ্ঞানী একদিন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় আরেকটি গাড়ি তাঁর পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ওভারটেক করলে সেই চমকিত বিজ্ঞানী অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠেছিলেন—Go to hell, এবং পরক্ষণেই স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যবোধে নিচু গলায় যোগ করেছিলেন—Please। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অধিকর্তা শ্রী স্বপন মজুমদারের রবীন্দ্রচর্চা ভবনের সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে লিখিত ‘গায়ের ঝাল ঝাড়ানো’ চিঠিখানি পড়ে আমার এই কথাগুলো মনে হল।

শ্রী মজুমদারের চিঠিতে যত না যুক্তি, তার থেকে অনেক বেশি ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তাঁর ব্যঙ্গ তার উদ্দিষ্ট ব্যঙ্গ্য হারিয়েছে। ‘রবীন্দ্র ভাবনা’ পত্রিকার যে সম্পাদকীয়ের বিরুদ্ধে শ্রীঅধিকর্তার বিবোধগার, সেটা পুনরায় পড়ে দেখলাম—তা ছিল অতি নিরীহ কয়েকটি জিজ্ঞাসা—রবীন্দ্র ভবনের কাজকর্ম সম্পর্কে। রবীন্দ্রভবন কারোর খাস তালুক নয়—সর্ব সাধারণের সম্পত্তি। অধিকাংশের অগোচরে যদি কোন ওয়েবসাইট থেকে থাকে, সেই সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার ফলে কেউ যদি সমৃদ্ধতর রবীন্দ্র-তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করেন—তাতে এত রেগে যাবার কারণ কি বুঝলাম না। ঋনিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মিলটন-গ্যেটে-গান্ধীজির উল্লেখ দেখে বুঝতে পারলাম—ওসব বিষয় অধিকর্তার জানা আছে। সেটা আমরা না জানলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

পত্রলেখকের উচ্চারিত Go to hell স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু অনুচ্চ সৌজন্য বোধক Please কথাটার চিহ্নমাত্র চিঠিতে কোথাও পেলাম না। ইতি—

মনোজ রায়

139, নেতাজী সুভাষ রোড

রাজপুর

24 পরগণা (দ)

Dear Mr Mazumder,

Bengalis like us who have been born and brought up in Bengal, but is now living outside the state, carry very few objects of pride from our native land with Tagore being surely one or may be the foremost of those.

I cannot express how happy and proud I feel whenever somebody show reverence to me only because I have read some Tagore works.

But I was really shocked to read your letter in the 'Rabindra Bhavna' magazine published by the Tagore Research Institute. I did not think the comments made by the magazine editors deserve a counter-attack of such insipid language.

Your language is quite unsuitable of the chair your are holding. And in trying to taunt them by asking whether other big names engaged in similiar works are doing something better than Vishwa Bharati, you only have exposed our traditional mindset of following others rather than creating instances to be followed.

I only hope people of other languages who still hold Tagore and Vishwa Bharati in high esteem and can read Bengali to some extent don't get to read your letter..

Yours truly
Archiman Bhaduri
95, Sarvodaynagar - III
Ghatlodiya 380061
Ahmedabad, Gujarat

[গত সংখ্যা 'রবীন্দ্রভাবনা' পড়ে এক প্রবাসী বাঙালি তনয়ের e-mail-য়ে পাঠান
প্রতিক্রিয়াটি এইসঙ্গে অংশত মুদ্রিত হল।—স. র. ভা.।]

প্রতিবেদন

পঙ্কজকুমার মল্লিক সংগীত সভা

২০ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই আসর বসেছিল। মঞ্জুলা বসু প্রারম্ভিক আলোচনায় বলেন যে পঙ্কজকুমারের জন্যই বাঙালি সংগীতকার, বাংলা সংগীত সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মুম্বাইতে ঘরোয়া আসরে পঙ্কজকুমার মল্লিকের গাওয়া গান অজিত শেঠ ও নিরুপমা শেঠ ক্যাসেটে ধরে রেখেছিলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত ছিল, বাংলা এবং হিন্দিতে।

সভায় স্মৃতিচারণা করেন রত্ন মুখোপাধ্যায়। পঙ্কজকুমারের সঙ্গে আকাশবাণীতে তাঁর পরিচয় হওয়ার বর্ণনা দেন তিনি। সংগীতের আসর বসিয়েছিলেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়। গান গেয়েছেন রীতা রায়, অনিরুদ্ধ সিংহ, রমা বসু, মধুরিমা দত্ত, স্বপন সোম এবং অরুণলেখা গুপ্ত। বাণীকুমারের লেখা গান গাইলেন রমা বসু ‘তোমার চোখের চাওয়া’ এবং ‘তুমি রঙের বিলাস জাগায়ে’। স্বপন সোম গেয়েছিলেন মহিষাসুর মর্দিনীর গান ‘ওগো আমার আগমনী আলো’—এ গানটির দুরকম সুর দেওয়া হয়েছিল, শিল্পী দুটি সুরই শুনিয়েছিলেন। রীতা রায় গেয়েছিলেন ‘দুই পুরুষ’ ছবির গান (‘ওরে আমার গান’), ‘ইয়ে রাত এ মৌসুম’ ও ‘তেরে মন্দির কা হুঁ দীপক জ্বল্ রহা’। মধুরিমা দত্ত গাইলেন ‘ফাগুন রঙিন পথ চেয়ে রই’ ও ‘ম্যায় তুমকো ভুল না যাঁউ’। সমবেত কণ্ঠে ‘মহাপ্রস্থানের পথে’র গান শোনালেন রমা বসু, অনিরুদ্ধ সিংহ, রীতা রায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়। অনিরুদ্ধ সিংহ গাইলেন ‘নাও মালা নাও গলে’ ও ‘আমি কান পেতে রই’। অরুণলেখা গুপ্ত গেয়েছেন সংগীতশিক্ষার আসরে পঙ্কজকুমারের শেখানো গান—গান্ধীজির উদ্দেশে রচিত—‘কে মহান প্রাণ’। তিনি ‘অধিকার’ ছবির ‘দুঃখে যাদের জীবন গড়া’ গানটিও গাইলেন, ছবিতে এই গানটি গেয়েছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, পাহাড়ি সান্যাল ও প্রতাপ রায়। তিনি আসরে শেখানো ‘প্রভু মেরে অয়ন চিত না ভরো’ ভজনটিও গেয়েছেন। এটির কোনো রেকর্ড নেই। এছাড়া গেয়েছেন ‘জিসে মেরি ইয়াদ না আয়ে’। সুশীল চট্টোপাধ্যায় ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ গেয়েছিলেন সব শেষে।

শিক্ষক দিবস

১৫ মার্চ এই অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীরাই আয়োজন করেছিল। স্বাতী মিত্র ‘মিথ্যে কথা’ কবিতাটি পড়ে সবাইকে খুশি করেছে। রমা বসুর পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরা গান গেয়েছে।

শিক্ষকদের মধ্যে রমাপ্রসাদ দে স্বরচিত কবিতা পড়েন। আবৃত্তি করেন পিনাকী ভাদুড়ী। গান গেয়েছেন রমা বসু, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বতী রায়, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমেনদার কথা বলেন সত্যবান মিত্র। সঞ্চালক ছিলেন মিলি চট্টোপাধ্যায়। এদিন ছাত্রছাত্রীরা ভবন তহবিলে ৫০১ দান করেছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য

২৪ এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রচর্চাভবনে অধ্যাপক স্বরাজ সেনগুপ্ত এই ভাষণ দিলেন। প্রারম্ভে তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের লেখক ডেরেক ওয়ালকটের Another life-য়ের তুলনা দিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে যন্ত্রণার পরে যখন সব পাওয়ার কথা বলেছেন ওয়ালকট—তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়েছে বক্তার। জীবনের দুঃসহ দিনে রবীন্দ্রনাথই বেঁচে থাকতে উদ্দীপ্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সেসময়ে বৈপরীত্য দেখেছিলেন অনেক বিশিষ্ট মানুষ। বক্তা বলেন এ দুয়ের সমন্বয়কে কেউ ধরতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ মানসিক মুক্তি চেয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন ‘লোকস্বরাজ’ নামে একটি শব্দ। Rationalism-য়ের সঙ্গে nationalism-য়ের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে। একে বৈপরীত্য না বলে সমন্বয়ের চেষ্টাই বলা উচিত। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে Creative realism, Romantic realism এবং Mystical realism-য়ের সামঞ্জস্য গড়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কবি-গল্পকার-উপন্যাসিক-নাট্যকার ইত্যাদি ছাড়াও তিনি গায়ক-অভিনেতা-শিল্পী। তাঁর আঁকা ছবি আজও আমাদের কাছে পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। তিনি গান্ধীজিরও আগে পল্লী পুনর্গঠনের কথা বলেছেন। তিনি আঘাতে বিষম হয়েছেন, মর্মান্বিত হননি। তাঁর ‘সমন্বয়’ একটি বিশ্বাসের জগৎ। মানুষ ও মনুষ্যত্বই সেই জগৎ।

সভায় কয়েকজন কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, বক্তা তার জবাব দেন। ধন্যবাদ দেন পিনাকী ভাদুড়ী।

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ স্মারক বক্তৃতা

১০ এপ্রিল এই ভাষণের পূর্বে মঞ্জুলা বসু দীনবন্ধু এবং ভারতবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের কথা বলেন। তাঁকে যে আমরা ভুলে গিয়েছি এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মূল ভাষণ দেন পিনাকী ভাদুড়ী। তাঁর বিষয় ছিল : রবীন্দ্রনাথ ও খ্রিষ্টধর্ম। ভাষণটি আমরা প্রকাশ করব।

অ্যাণ্ড্রুজের প্রিয় কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত সভায় গাওয়া হয়েছিল। গান গেয়েছেন রমা বসু, শাম্ভতী রায় ও শিখা বসু। সভাপতি ছিলেন দেবব্রত পালিত। তিনি মূল ভাষণটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেন। সুন্দা চক্রবর্তী ধন্যবাদ দেবার সময়ে ভাষণটিকে তথ্যসমৃদ্ধ বলেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী শতবার্ষিক আলোচনাচক্র

১৭ ও ১৮ মার্চ ২০০১ বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা ছিলেন অত্র বসু। তাঁর আলোচনার শিরোনাম ছিল—সুধীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত আত্মজীবনী সম্পর্কে আলোচনা : The World of Twilight : একটি বিভ্রান্ত জীবনের উপক্রমণিকা।

রবীন্দ্র গ্রন্থ প্রদর্শনী

২ মে রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন সুচিত্রা মিত্র। মঞ্জুলা বসু সূচনায় সুচিত্রা মিত্রের আগমনে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন সুচিত্রাদি আমাদের ঘরের মানুষ, এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সোৎসাহে সাড়া দিয়েছেন। সুচিত্রা মিত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন যে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের তিনি ক্রমাগত বলে আসছেন যে কেবল গান গাইলেই চলবে না, রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে তাঁর বই বারবার পড়তে হবে। এইরকম একটি অনুষ্ঠানে এসে তিনি যে প্রীতিলাভ করেছেন সেকথা বলেন তিনি। উদ্বোধনে ‘সকল কলুষ তামস হর’ গানটি সমবেতভাবে গাওয়া হয়। যখন সুচিত্রা মিত্র প্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন তখন গাওয়া হয় ‘এত আলো জ্বালিয়েছ’। গান গেয়েছেন রমা বসু, অত্র বসু, শ্রীলা বসু, শিখা বসু, শাস্বতী দাশ, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্বতী রায়। অনুষ্ঠানটি সুচিত্রা মিত্র তাঁর উৎসাহ দিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। প্রদর্শনী ১০ মে পর্যন্ত চলেছিল।

ভবন উদ্বোধন দিবস

১৯৮০ সালের ৪ মে এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন আচার্য সুকুমার সেন। বহু বিশিষ্ট মানুষ শোভাযাত্রা করে ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। পথে তাঁরা গান গেয়েছেন, আবৃত্তি করেছেন। সন্ধ্যায় ভবনে গান গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। সেইসব কথা স্মরণ করলেন আভা নাথ এ বছরের ৪ মে তারিখের সন্ধ্যায়। পুরোনো প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কথা বললেন জয়ন্তী রায়। বহুদিন পরে এসে স্মৃতি জাগালেন শোভনা ঘোষ, সত্যা চক্রবর্তী। দীপক ঘোষ ও সোমদত্তা ঘোষের পুত্র ভারতেন্দু ঘোষ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।

‘নটরাজ’ গীতিনাট্যটি পরিবেশিত হল এরপরে। পাঠে ছিলেন মিলি চ্যাটার্জি, বাসন্তী মুখার্জি, স্বপ্না চ্যাটার্জি, অনুলেখা সরকার, শুভ্রা মুখার্জি, বাসবী চক্রবর্তী। গান গেয়েছেন রমা বসু, শিখা বসু, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্বতী দাশ, শাস্বতী রায়, সুমিত্রা সাহা, রীণা রায়। তবলা সঙ্গত করেছেন উদয় ভৌমিক। শেষ সমবেত গানটির সঙ্গে নেচেছেন মিলি চ্যাটার্জি, মৃদুচ্ছন্দা পালিত।

অনুষ্ঠানের শেষ গানটি গেয়েছেন সুকন্যা নাথ।

ধন্যবাদ দেন মঞ্জুলা বসু। সঞ্চালক ছিলেন পিনাকী ভাদুড়ী।

রবীন্দ্রচর্চার নতুন বই

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থের নাম দেওয়া হল এখানে। অনুরাগীরা উৎসাহিত হতে পারবেন।

পুনশ্চক্য পরিক্রমা — বাঁশরী রায় চৌধুরী — বামা — ৪০.০০

রবীন্দ্রকবিতালোক — জ্যোতির্ময় ঘোষ — দে'জ — ৯০.০০

নবজাতক : বিভাস ও প্রতিভাস – রামজীবন আচার্য – বামা – ৩০.০০
 কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর গল্প – জ্যোতির্ময় ঘোষ – দে'জ – ৭০.০০
 হিন্দুজাগরণ : বিবেকানন্দ : রবীন্দ্রনাথ – পরমেশ চৌধুরী – নয়্যা উদ্যোগ ৩০.০০
 রবীন্দ্রকাব্যে নটরাজ কল্পনা – সুলেখা চট্টোপাধ্যায় – পুস্তক বিপণী ৭৫.০০
 আলোচনার আলোকে : রবীন্দ্র ছোটগল্প – অশোক কুণ্ডু – গল্পগুচ্ছ ৭৫.০০
 রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত মন – অরুণ মজুমদার –
 সুবর্ণরেখা ১৫০.০০
 উপন্যাসে আধুনিকতা : চোখের বালি – বীরেন চট্টোপাধ্যায় – বামা ৫০.০০
 রবীন্দ্রনাথ : শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে – নেপাল মজুমদার – দে'জ ৭০.০০
 ইংলণ্ডের দিকপ্রান্তে রবির উদয় রবির অস্ত – চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম – এষণা ১০০.০০
 রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীজীবন – অসীমকুমার মণ্ডল – প্রভা ১০০.০০
 রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান – দীপকর চট্টোপাধ্যায় – আনন্দ ১৫০.০০
 রবিজীবনে খেলা ও খেলা ভোলার দিন – সুমিত্রা সাহা – ভারবি ৩০.০০

রবীন্দ্রচর্চাভবনে প্রদত্ত উপহার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া ইকবাল রবীন্দ্রচর্চাভবনে কয়েকটি রবীন্দ্রচর্চার বই উপহার দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সঙ্গে বইগুলির তালিকাটি দেওয়া হল।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গীতাঞ্জলি (ইংরেজি ও বাংলা)

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমের সীমান্তে – ড. বদিউজ্জামান

রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা – হারুণ হাবিব

জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৩৯৯, ১৪০১, ১৪০২

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গের কিছু কথা—সইফুদ্দিন চৌধুরী

কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী—আবুল মোমেন

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা মূল্যায়নের রূপান্তর—মনিরা কায়েস

অধ্যাপক চঞ্চল কুমার ব্রহ্ম তাঁর বই আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর বইটির নাম 'ইংলণ্ডের দিকপ্রান্তে রবির উদয়, রবির অস্ত'। তাঁকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠান

অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এবং তদানীন্তন আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে চলিত ভাষার ব্যবহার কেমন হচ্ছিল, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়েছিলেন। ভাষণটি আমরা প্রকাশ করব।

গান গেয়েছেন পূর্ববী বসু ও সুহৃদা ঘোষ। ধন্যবাদ দেন মৃদুচ্ছন্দা পালিত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ

১১, ১২, ১৩ এপ্রিল এই বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্রে ১২ এপ্রিল রবীন্দ্রসাহিত্যে মূল্যবোধ বিষয়ে বলেন অভ্র বসু। ১৩ এপ্রিল আলোচনাচক্রের শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মঞ্জুলা বসু। ঐ অধিবেশনের বিষয় ছিল : After Socialism and Capitalism : An Alternative form of Development. তিন দিনের সামগ্রিক আলোচনাচক্রটির শিরোনাম ছিল : Society, Value & Consciousness.

মঞ্জুলা বসু

পূর্বোক্ত অধিবেশন ছাড়াও মঞ্জুলা বসু পর পর কয়েকটি সাংস্কৃতিক আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। সেগুলি হল :

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র—এখানে ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ‘রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা’ বিষয়ে ভাষণ দেন।

বৈতানিক — ২৫ বৈশাখ জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে বৈতানিকের আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে তিনি ‘রবীন্দ্রসংগীতে সুরের ছন্দ’ বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাটি সংগীত সহযোগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—১২ মে ইন্দুমতী সভাগৃহে পরিষদের অনুষ্ঠানে তিনি ‘রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারা’ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

সপ্তকের এক দশক

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রতিষ্ঠান ‘সপ্তক’ এক দশক অতিক্রম করল। ১৩ মে শিশির মঞ্চে এই উপলক্ষ্যে সংকলিত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। সকালবেলা সুচিত্রা মিত্র, সুবিনয় রায় ও শঙ্খ ঘোষকে প্রণাম জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপরে পরিবেশিত হয় ‘রূপ থেকে রূপে’—^১ রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যাংশে কবিতা ও গানের রূপরীতিগত পরিবর্তনের নানা বৈচিত্র্য দেখানোই ছিল এই আলেখ্যটির উদ্দেশ্য।

সঙ্খ্যায় ছিল আরেকটি আলেখ্য, ‘বাঁধন ভাঙার সাধন’। এই অংশে ছিল গানের সুরে ধ্রুপদী রাগরাগিনীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। আলেখ্যদুটি রচনা করেছিলেন আলপনা রায়। ‘সপ্তক’-এর সদস্য শিল্পীরা ছিলেন গানে ও পাঠে। একক রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন প্রাক্তনী।

গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় তিনদিন ব্যাপী রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক একটি প্রদর্শনী চলেছিল। সহায়তা করেছিলেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবন। এইসঙ্গে ‘ঐ আসনতলে’ নামে একটি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদনা করেছেন আলপনা রায়।

রবীন্দ্রনাথ : ঘরে বাইরে

(সূত্র : ২৫.৫.০১য়ের স্টেটসমানে র‍্যাডিচের নিবন্ধ)

১২ ও ১৩ মে আমস্টারডামে এবং ১৯ মে গ্রাসগোতে দুটি বড়োমাপের রবীন্দ্রবিষয়ক অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

১৯৮৫ সালে লণ্ডনে যে টেগোর সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবারে তারই শাখা খোলা হল গ্রাসগোতে। প্রবাসী বাঙালিরা তো এসেছিলেনই, তাছাড়া গ্রাসগো-র গ্রন্থাগার ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। ভারতের কনসাল-জেনারেল গোভাই ভাষণ দেন এখানে। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত স্কটিশ সুরের গান শোনান হয়। সুকান্ত রায় পরিচালিত কবির 'ছেলেবেলা' দেখানো হয়েছিল। ছবিটি নাটকীয়, তবে সাবটাইটলের দিকে নজর দেওয়া দরকার। তার ভাষাটি অস্বচ্ছ ছিল। র‍্যাডিচে কবির ক্ষুদ্রায়তন কবিতাগুলি নিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন—
Sparkling, yet tender.

আমস্টারডামে Arts and Ideas of Tagore আলোচনাসভাটি দীর্ঘায়িত হয়েছিল। শিবনারায়ণ রায় (From the Broken Nest to Visha Bharati), শর্মিলা রায় (Music of Tagore, its modernity), কৃষ্ণা দত্ত (Letto of a Myriad minded Man), অ্যান্ড্রু রবিনসন (Poet to Poet: Rabindranath and Satyajit Roy) ছিলেন, ছিলেন টিমোথি হাইম্যান (Rabindranath from the stand point of Contemporary Art)। কবির আঁকা ছবি নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনায় সম্পূর্ণ বিপরীত মত পাওয়া গিয়েছিল।

গানের আসরে শর্মিলা রায় গেয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীত। Prof. de Grot ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৭৯ নং কবিতাটি সুর বসিয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ বিভিন্ন শিল্পীর আরো প্রয়োজন হচ্ছে, ওলন্দাজ গায়কেরা কবির গান ইংরেজি এবং ওলন্দাজ ভাষায় নিবেদন করেছিলেন।

কৌশিক সেন

১০ জুন রবীন্দ্রচর্চাভবনের সদস্য কৌশিক সেনের জীবনাবসান হয়েছে। হাসিখুশি এই মানুষটি আমাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নীলা সেন আমাদের গ্রন্থাগারিক। আমরা মর্মান্বিত।

গত সংখ্যার সংশোধনী

জানুয়ারি-মার্চ ২০০১ সংখ্যার রবীন্দ্রভাবনায় দুটি ভুল ছাপা হয়ে গিয়েছে।

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পঙক্তি	আছে	হবে
৯	পরিশিষ্ট	১	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্যে
১২	—	১০	করছে	করতে

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ থেকে দুটি নাট্যদল কলকাতায় অভিনয় করে গিয়েছেন। তাঁরা যে দুটি নাটক প্রযোজনা করেছিলেন সে দুটি হল 'রাজা' ও 'বিসর্জন'। কবির এই দুটি নাটক দীর্ঘকাল আগেই ব্যবসায়িক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সৌখিন নাট্যদলগুলিও এই নাটকগুলি বারবার মঞ্চস্থ করেছেন। প্রতিটি প্রযোজনাতেই বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে, কুশলী অভিনেতারা অভিনয় করেছেন নিজ নিজ বিশ্লেষণ অনুযায়ী। পরিচালকেরা তাঁদের ভাবনা চিন্তার রূপ দিয়েছেন নাটকগুলিতে। প্রতিটি অভিনয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়ে বিশিষ্ট হয়েছিল। মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবহার, সংগীতের অনুষ্ণ, নাট্যবস্তুর interpretation—সবই দর্শক এক একরকম ভাবে দেখতে পেয়েছেন।

'বিসর্জন' নাটক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেছিলেন। ব্যবসায়িক মঞ্চে শিশিরকুমার এবং পরবর্তী কালে গ্রুপ থিয়েটারে শম্ভু মিত্র এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। 'বিসর্জন' নাটকের শতবর্ষ উপলক্ষে নাটকটি নিয়ে আরেকবার নাট্যদলগুলি উৎসাহিত হন এবং কয়েকটি নাট্যদল তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অভিনয় করেন। তার ফলে দর্শকেরা নাটকটি সম্পর্কে নতুন নতুন ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন।

তুলনায় 'রাজা' নাটকটি কম অভিনীত হয়েছে। এ নাটকের গূঢ়ার্থ নিয়ে পণ্ডিত ও রসিকজনদের মধ্যে নানা মত থাকায় নাটকটির মঞ্চায়ন সীমিত। শম্ভু মিত্র 'রাজা' নাটক মঞ্চস্থ করে বড় একটি আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকেও সম্প্রতি এই নাটক মঞ্চস্থ হল। খুব সম্প্রতি 'সংবর্ত' নাট্যদলটি এই নাটকটি প্রযোজনা করেছেন। এঁরা কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির নবরূপ মঞ্চস্থ করেছিলেন। সে নাটকটি মূলত জার্মান পরিচালক Mehring বিদেশিদের জন্য অভিনয় করেছিলেন। 'সংবর্তের' পরিচালক সুনীল দাশ সেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বদেশেও নাটকটি অনেকবার অভিনয় করিয়েছেন।

সুনীল দাশ 'রাজা' নাটকটি নতুন ভাবে মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁর প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য হল যে নাটকটি তিনি নতুনভাবে সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদনা সবসময়েই নাটকের প্রাণ—শম্ভু মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে নাটক কিভাবে কাটতে হয় তা তিনি শিশিরকুমারের কাছে শিখেছিলেন। শিশিরকুমারও বলতেন, 'দরকার হলে ওলট পালট করে নিই।' এই ওলটপালটই হল সম্পাদনা। সুনীল দাশ 'রাজা' নাটকটি সম্পাদনা করে সংহত করেছেন, মেদ ঝরিয়ে দিয়েছেন

নাটকের অঙ্গ থেকে। এজন্য ‘রাজা’ নাটকের ইংরেজি রূপ King of the Dark Chamber-য়েরও সাহায্য নিয়েছেন তিনি। অভিনয়ের মধ্যে এক ধরনের ক্ষিপ্ততার চলন এনেছেন। তবে কিছু কিছু সংলাপের wit তিনি বাদ দিয়েছেন, হয়তো সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা যেতো। অভিনয়টি দেখতে দেখতে এই সম্পাদনা সম্পর্কে দর্শক ওয়াকিবহাল হবেন।

‘বিসর্জন’ নাটকটি বাংলাদেশের যে দলটি অভিনয় করেছেন তাঁরা দৃশ্যান্তর বোঝাবার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রতিটি দৃশ্যান্তরই সূচিত হয়েছে সমবেত সংগীত দিয়ে—যা পরিবেশিত হয়েছে লোকনৃত্যের সঙ্গে। গ্রামীণ সংগীতের যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করে এই গান ও নৃত্যকে তাঁরা উপস্থিত করেছেন। প্রতিটি দৃশ্যান্তরেই নাচের প্যাটার্নটি তাঁরা খানিকটা বদলে দিয়েছেন, ফলে একঘেয়েমি আসেনি এবং ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে।

‘রাজা’ নাটকে সুনীল দাশ নাটকটি গোড়াতেই টানটান করে তুলেছেন—সরাসরি তাই নাটকে দর্শক প্রবেশ করে যেতে পারেন। এই নাটকের রূপকার্থ নিয়ে পণ্ডিতরা খুবই গবেষণা করে থাকেন, ‘সংবর্ত’ সেই সব রূপক নিয়ে মাথা ঘামান নি, এ নাটক থেকে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বও তাঁরা প্রকাশ করতে চাননি। বরং এটিকে সোজাসুজি প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দে বেঁধেছেন। হোক না এ নাটক রাজা রাণীকে নিয়ে লেখা, কিন্তু সেই নাটককে আমাদের কাছের চেনা মানুষের চেহারা দিয়েছেন এঁরা। ‘রাজা’, এ নাটকে কে, এ প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে ফিরতে হয় না, এক আর্ত প্রেমিক হিসেবেই তাঁকে চেনা যায়। চেনা যায় সেই রানীকেও, যিনি কেবল রূপ খুঁজে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত দিক্ভ্রান্তি কাটিয়ে প্রেমকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। এ নাটকের অন্যান্য সুযোগসন্ধানী চরিত্রগুলির জীবনযাপন কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে তাও এই অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকটি থেকে এই দৈনন্দিন জীবনকে আবিষ্কার করা যায় কিনা, পরিচালক সেটিও পরীক্ষা করে দেখেছেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে নাচের টুকরো টুকরো দোলা লাগিয়ে দর্শককে আন্দোলিত করে দিয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকটি সম্পূর্ণত মুকাভিনয়ের মাধ্যমে নিবেদন করেছেন যোগেশ দত্ত। নামকরণ করেছেন ‘খোলো দ্বার’। সংলাপবিহীন এই মাইম পরিবেশনে সাহস এবং কল্পনাশক্তি আছে। (প্রসঙ্গত, ১৯২৪য়ে কবি ‘অরুণরতন’ নাটকটি অনুরূপভাবে প্রযোজনা করেছিলেন।)

ডাম্পারস গিল্ডের ‘তোমার মাটির কন্যা’ রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা অবলম্বনে তৈরি। পরিচালিকা মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে এ নাটকে প্রকৃতির মা-কে সকলেই ডাইনি হিসেবে উপস্থিত করেন। কিন্তু যিনি তাঁর মহামন্ত্রে মহাসন্ন্যাসীকে আকর্ষণ করতে পারেন, তিনি ঐ সীমানায় বদ্ধ থাকবেন কীভাবে? শ্রীমতী সরকার বলেছিলেন যে তিনি আসামে মন্দিরের

ভৈরবীদের দেখেছেন যাঁদের স্থিতধী ও জ্ঞানী বলেই মনে হয়েছিল। মাটির কন্যার প্রযোজনায় সেইটিই উপস্থিত।

সম্প্রতি কবির একগুচ্ছ বসন্তের গান নিয়ে 'ডাক্তারস গিল্ড' নিবেদন করলেন 'আনন্দ বসন্ত সমাগমে'। পরিকল্পনা প্রয়াত মঞ্জুশ্রী দেবীর। প্রযোজনাটি অভিনব। বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দলে নাচগুলিকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। একই গানের নৃত্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। এবং কখন যে তারা সকলে এক হয়ে গিয়েছে সেটি অকস্মাৎ অনুধাবন করে দর্শক পুলকিত হয়েছেন।

Performing artisteরা রবীন্দ্রনাথকে কত নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চাইছেন, এগুলি তারই উদাহরণ। যাঁরা রবীন্দ্রসৃষ্টির একই ভঙ্গিমার নিবেদন দেখে দেখে ক্লান্ত, তাঁরা এইসব মঞ্চায়ন দেখে আনন্দিত হবেন। এদের সবগুলিই উৎকৃষ্ট এমন হয়তো বলা চলে না, তথাপি সেই সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যেই সম্ভাবনার দিগন্ত নিত্য প্রসারিত।



প্রকাশিত হতে চলেছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নতুন বই

আশ্রমকন্যা রমা চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন এবং পুরোনো আশ্রমিকদের

সম্পর্কে অজস্র স্মৃতিচিত্রের সমাহার।

সত্তাব্য প্রকাশ — ২২শে শ্রাবণ ১৪০৮

20 . . .
10 . . .

উৎপল চৌধুরী কর্তৃক রবীন্দ্রচর্চা ভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা-২৬
থেকে প্রকাশিত ও ওয়েলনোন প্রিন্টার্স, ১২৪বি রাজা রামমোহন সরণী,
কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১৫ টাকা